Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তুবা আক্তার

রোলঃ 23100120859

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তুবা আক্তার

রোলঃ 23100120859

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তুবা আক্তার, আইডিঃ 23100120859 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তুবা আক্তার

আইডিঃ 23100120859

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

জিহাদের পরিচয় প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্য 3

জিহাদ: কখন ফরজ? 8

জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে নয় 24

রাসূল ﷺ এর যুগে জিহাদ 25

জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 68

জিহাদের ফজিলত 72

জিহাদ ও ভুল ব্যাখ্যা 80

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট 85

উপসংহার 90

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ .وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য এতে রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। সেই দিকনির্দেশনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো **(الجهاد)** জিহাদ।

জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো চেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যায়, অত্যাচার ও শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং একইসাথে নিজের নফসের বিরুদ্ধে আত্মসংযমের প্রচেষ্টা চালানো।

ইসলামী শরীয়তের জিহাদের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এটি যেমন আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম, তেমনি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। কুরআন ও হাদীসে বারবার জিহাদের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর শক্তি, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ۭوَجَاہِدُوْا فِی اللهِ حَقَّ جِہَادِہٖ

অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহর পথে যথার্থভাবে জিহাদ কর।" (সুরা হাজ্জ ৭৮)

আরেক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়।" (সূরা তাওবা: ১১১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سلطانٍ جائرٍ

অর্থাৎ, “সর্বোত্তম জিহাদ হলো অন্যায় শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।” (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৪৪)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য, গুরুত্ব, ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা। আধুনিক যুগে অনেক সময় জিহাদকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, কখনো সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থার সাথে একীভূত করা হয়।অথচ ইসলামী শরীয়তে জিহাদ একটি সুসংগঠিত, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সংগ্রাম।

জিহাদের পরিচয় প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্য

জিহাদ ইসলামী চিন্তাধারার একটি বহুমাত্রিক ধারণা।"জিহাদ" (الجهاد) শব্দটি আরবি **"জাহাদা"** (جَاهَدَ) মূল ধাতু থেকে এসেছে,যার অর্থ প্রচেষ্টা, চেষ্টা বা সংগ্রাম। কিন্তু ইসলামে এ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। আরবিতে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর আভিধানিক অর্থ একরকম কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থ রয়েছে। জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, ত্যাগ ও কষ্ট করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা, ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করা, মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার
জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

জিহাদ চার প্রকার। সেগুলো হচ্ছে:

১- নফসের জিহাদ: নফসের সাথে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে।

(১) ইলম, দ্বীনে হক ও হিদায়াতের তালাশের চেষ্টা করা এবং এর উপর নফসকে বাধ্য করা। কারণ দ্বীনে হকের জ্ঞান অর্জন ছাড়া সাফল্য অর্জনের কোন সুযোগ নেই। বান্দা তা অর্জনে ব্যর্থ হলে ইহকাল ও পরকালে সে হতভাগ্য হবে।

(২) বান্দা ইলম অর্জন করার পর ইলমকে আমলে পরিণত করবে। কারণ আমল ছাড়া ইলম তার কোন উপকারে আসবেনা।

(৩) ইলম ও আমলের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিবে। অজ্ঞদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে। অন্যথায় সে আল্লাহর নাযিলকৃত হিদায়াত ও সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং তার ইলম অন্যের উপকার করলেও তার নিজের কোন উপকার করবে না এবং তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবেনা।

(৪) আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজে যে সমস্ত বিপদ আসে বান্দা তার উপর নফসকে সবর করতে বাধ্য করবে। মানুষেরা তাকে কষ্ট দিলেও সে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে সব কিছুই মাথা পেতে মেনে নিবে

২- শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তানের সাথে জিহাদের দু’ টি স্তর রয়েছে।

(১) ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান যে সমস্ত সন্দেহ এবং ওয়াসওয়াসা বান্দার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয় তা প্রতিহত করার সংগ্রাম করা।

(২) শয়তান মানুষের অন্তরে পাপ কাজের প্রতি যে আগ্রহ ও আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করার সংগ্রামে সদা প্রচেষ্টা চালানো।

৩- কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা: কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদেরও চারটি স্তর রয়েছে।

(১) অন্তরের মাধ্যমে জিহাদ,

(২) জবানের মাধ্যমে জিহাদ,

(৩) মালের সাহায্যে জিহাদ ও

(৪) জান ও হাতের মাধ্যমে জিহাদ। কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে হবে অস্ত্রের সাহায্যে। আর মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করতে হবে জবানের সাহায্যে।

৪- যালিম, বিদ 'আতী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিহাদ: যালিম, বিদ 'আতী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিহাদের তিনটি স্তর রয়েছে।

(১) ক্ষমতা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করতে হবে।

(২) হাত দিয়ে করতে অক্ষম হলে জবান দিয়ে করতে হবে।

(৩) আর তাতেও অক্ষম হলে অন্তর দিয়ে করতে হবে।

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী

(১) জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া।

(২) অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।

(৩) অঙ্গিকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।

(৪) ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ সমর্থন করেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে; আর নিশ্চয়ই

আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তারা সেই লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু এই কারণে যে তারা বলে, "আমাদের রব আল্লাহ।" যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে আরেক দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস হয়ে যেত সন্ন্যাসীদের উপাসনালয়, গির্জা, উপাসনালয় ও মসজিদ–যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। তারা সেই লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আর সব কিছুর পরিণতি আল্লাহর কাছেই। (সূরা হজ আয়াত ৩৮–৪১)

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ۖ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

যারা দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে আখিরাতকে ক্রয় করেছে তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে–সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক–আমি তাকে অবশ্যই মহা প্রতিদান দান করব।আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং সেই দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর না– যারা বলে, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ থেকে বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নির্ধারণ কর এবং তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী দান কর।" মুমিনরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর কাফিররা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল। (সূরা নিসা আয়াত ৭৪-৭৬)

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল? আর তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ আল্লাহই অধিকতর উপযুক্ত যে তোমরা তাঁকেই ভয় করবে–যদি তোমরা মুমিন হও।তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাত দ্বারা তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের অপমানিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন।এবং তিনি তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার তওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।তোমরা কি মনে কর যে তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনো প্রকাশ করেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা তওবা আয়াত ১৩-১৬)

١ .الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল আমল ব্যর্থ করে দেন। যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা করো, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো। পরিশেষে যখন তোমরা তাদের পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদের কষে বাঁধো। এরপর হয় অনুগ্রহ করো, না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ করো–যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। আর যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্মফল নষ্ট করবেন না। তিনি অচিরেই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (আল্লাহর দ্বীনকে) সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন

এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন।আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেবেন। (সূরা মুহাম্মদ আয়াত ১,৪-৮)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক ও নিপীড়ন) দূর হয় এবং দ্বীন (আনুগত্য) পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সম্যক দ্রষ্টা।আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক; তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী! (সূরা আল-আনফাল ৩৯-৪০)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না ও পরকালেও বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না–তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে। (সূরা আত-তাওবাহ্- ২৯)

জিহাদ: কখন ফরজ?

শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা, ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করা, মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। জিহাদ বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত। তা কখনো ফরজে কেফায়া; কখনো ফরজে আইন।

ফরজে কেফায়া ও ফরজে আইনের অর্থ

ফরজে কেফায়া অর্থ এমন ফরজ, যার দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানের। কিছু মুসলমান আদায় করলে, সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। প্রত্যেককে সেই দায়িত্ব আদায় করতে হয় না। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে, তাহলে সবার উপর এর দায় থেকে যায় এবং সবাই গোনাহগার হয়। আর যদি কিছু লোক আদায় করে, কিন্তু কাজটি আদায় হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ লোক আদায় না করে, তাহলেও বাকিদের উপর তার দায় থেকে যায় এবং তারা গোনাহগার হয়।

পক্ষান্তরে ফরজে আইন অর্থ এমন ফরজ, যা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ হয়। যার যার উপর ফরজ হয়, তাদের সবাইকে তা আদায় করতে হয়। অন্যথায় তারা গোনাহগার হয়।

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ মুসলামনদের দ্বীন ঈমান, ইজ্জত আব্রু, ভূখণ্ড ও ধন সম্পদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যেই পরিমাণ লোকের প্রয়োজন, পুরো উম্মত থেকে সেই পরিমাণ লোক জিহাদি কার্যক্রমে যুক্ত থাকা ফরজে কেফায়া। এই পরিমাণ লোক উক্ত ফরজ আদায় করলে উম্মতের সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এই পরিমাণ লোক যদি তা আদায় না করে এবং ফরজটি অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে যারা যারা তা আদায়ের চেষ্টা করবে না, তারা সবাই গোনাহগার হবে।

হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

قَالَ (الْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، إذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ) ... فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ (فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ) لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ، وَلِأَنَّ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَطْعَ مَادَّةِ

الْجِهَادِ مِنْ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ (إلَّا أَنْ) (يَكُونُ النَّفِيرُ عَامًّا) فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ....

وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: الْجِهَادُ وَاجِبٌ إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يُحْتَاجَ إلَيْهِمْ، فَأَوَّلُ هَذَا الْكَلَامِ إشَارَةٌ إلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَآخِرُهُ إلَى النَّفِيرِ الْعَامِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْتَرَضُ عَلَى الْكُلِّ.

"ইমাম কুদুরি রহ. বলেছেন, (জিহাদ ফরজে কেফায়া। যখন একদল লোক তা আদায় করবে, বাকিদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে)।

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক দিয়ে যখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, বাকিদের থেকে তার দায় সরে যাবে। যেমন জানাযার সালাত এবং সালামের উত্তর। (যদি কেউই তা আদায় না করে, সকল মানুষই তা ত্যাগ করার কারণে গোনাহগার হবে)। কারণ ফরজ সকলের উপরই। আর সবাই জিহাদে বেরিয়ে পড়লে যেহেতু ঘোড়া অস্ত্র ইত্যাদির মতো জিহাদের উপায় উপকরণ প্রস্তুতের পথও বন্ধ হয়ে যাবে, এজন্য ফরজে কেফায়া। (তবে যদি 'নাফিরে আম' হয়) তখন ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।...

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. জামিউস সাগীরে বলেছেন, 'জিহাদ ফরজ। তবে তা না করার সুযোগ থাকবে, যতক্ষণ না তাতে সকলের প্রয়োজন পড়ে'। তাঁর এই বক্তব্যের প্রথমাংশ ফরজে কেফায়ার ইঙ্গিত বহন করে এবং শেষাংশ নাফিরে আমের ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, তখন সকলের অংশগ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। সুতরাং তখন সকলের উপর ফরজ হয়ে যাবে।" -হেদায়া; ফাতহুল কাদিরসহ: ৫/৪৩৬-৪৪১

কাজি ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসি রহ. (মৃত্যু: ৫৪১ হি.) বলেন,

والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين.

"যে বিষয়টির উপর ইজমা চলে আসছে তা হল, উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, তাহলে অন্যদের থেকে এর দায়-ভার সরে যাবে। তবে যদি শত্রু কোনো ইসলামী ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়, তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়। -তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ: ১/২৮৯

তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়

এছাড়া বিশেষ তিনটি অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬২০ হি.) বলেন-

يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع؛ أحدها، إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام ... الثاني، إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه.

"তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ১. যখন (মু'মিন-কাফের) উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পলায়ন করা হারাম এবং অটল থেকে জিহাদ করা ফরজে আইন। ২. কাফেররা কোনো এলাকায় আক্রমণ চালালে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের উপর তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন। ৩. ইমাম যদি কোনো সম্প্রদায়কে জিহাদে বের হতে আহ্বান করেন, তাহলে তাদের সকলের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন।" -আলমুগনী: ১২/৪২৩

এবিষয়ে ইবনে কুদামা রহ. এর বক্তব্যটি গুছানো বিধায় তাঁর বক্তব্যটি উদ্ধৃত করলাম। অন্যথায় বিষয়টি হানাফি মাযহাবসহ সকল মাযহাবেই স্বীকৃত। দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯১ ও ৭/৯৮, আলবিনায়া: ৭/৯৬, রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭

ফরজে আইনের উপরোক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা কুরআন, সুন্নাহ'র দলিল ও ফিকহের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

এক. রাণাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি হলে

ফরজে আইনের প্রথম ক্ষেত্র ছিল, যখন কিতালের জন্য মুসলিম ও কাফের বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। এমতাবস্থায় ময়দান ছেড়ে পালানো হারাম ও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ۝

"হে ঈমানদারগণ, যখন কাফেরদের চড়াও হয়ে আসা অবস্থায় তোমরা তাদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন অথবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

করলে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।" –আনফাল: ১৫-১৬

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ত্বারী রহ. (৩১০ হি.) বলেন-

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قولُ من قال: حكمها محكم، وأنها نزلت في أهل بدر، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين، وأن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو، أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرفٍ القتال، أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتالٍ منهزمًا بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما، فقد استوجب من الله وعيده، إلا أن يتفضل عليه بعفوه.

"আমার মতে এই আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যার মাঝে তুলনামূলক সঠিক ব্যাখ্যাটি হল- আয়াতের বিধান এখনও বহাল রয়েছে। আয়াতটি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও; তার বিধান সব মুসলিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য শত্রুর মুখোমুখি হলে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা হারাম করেছেন। অবশ্য যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে কিংবা দারুল ইসলামে অবস্থানকারী মুমিন দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটলে ভিন্ন কথা। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যে দু'টি অবস্থায় পিছু হটা বৈধ করেছেন, তা ব্যতীত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, সে আল্লাহ তায়ালার ধমকের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা।" – জামিউল বায়ান ফি তা'বিলিল কুরআন ১৩/৪৪০

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন-

حرم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار... والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة.

"যখন আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ক্বিতাল ফরজ করেছেন, তখন তা (যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা) তাদের উপর হারাম করেছেন।... যুদ্ধ হতে পলায়ন ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ, যা কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা ও অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কেরামের ঐক্যমতে প্রমাণিত।" –তাফসীরে কুরতুবী ৭/৩৭১

আল্লামা শাওকানী রহ. (১২৫০ হি.) বলেন-

فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمن، وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز... وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة، وأن الفرار

من الزحف محرم، ويؤيد هذا: أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر... فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله في آية الضعف ...
ويؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر، كما في حديث «اجتنبوا السبع الموبقات، وفيه: والتولي يوم الزحف» ونحوه من الأحاديث

"আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য সকল যমানার সকল মু'মিনের জন্য এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তবে কৌশল হিসেবে কিংবা মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পিছু হটলে ভিন্ন কথা।... অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হল, এই আয়াতের বিধান এখনও অপরিবর্তিত। আয়াত আম তথা ব্যাপক, খাস নয়; এবং যুদ্ধ হতে পলায়ন হারাম। এ মতটিকে এ বিষয়টিও সমর্থন করে যে, আয়াতটি বদরের দিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে।... অতএব, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা হারাম। তবে আল্লাহ তায়ালা দুর্বলতার বিবরণ সম্বলিত আয়াতে যে শর্ত উল্লেখ করেছেন, সে শর্তসাপেক্ষে জায়েয।... এ ব্যাপারে যেসব সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ হতে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে, সেগুলোও এর সমর্থন করে। যেমন এক হাদীসে এসেছে– 'তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি গুনাহ থেকে বিরত থাক।' সাতটির একটি হল, 'যুদ্ধ হতে পলায়ন করা'। এ ছাড়াও এ জাতীয় আরো হাদীস রয়েছে।" – ফাতহুল কাদীর ২/৩৩৪

আরেকটি আয়াত

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, অটল থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" –আনফাল: ৪৫

আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি রহ. (১২২৫ হি.) বলেন-

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ للمحاربة فِئَةً يعنى جماعة كافرة ولم يصفها اشعارا بان المؤمنين لا يقاتلون الا الكفار فَاثْبُتُوا لقتالهم فان الفرار من الزحف كبيرة كما ورد في الصحاح من الأحاديث.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন লড়াইয়ের জন্য কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হও, (এখানে উদ্দেশ্য কাফের বাহিনী, কিন্তু তাদেরকে কাফের বিশেষণে বিষেশায়িত না করে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিনরা একমাত্র কাফেরের বিরুদ্ধেই

কিতাল করে), তখন তাদের সাথে লড়াইয়ে সুদৃঢ় থাক। কেননা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা কবিরা গুনাহ- যেমনটা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে।" - তাফসীরে মাযহারী ৪/৯৭

আল্লামা শানকিতি রহ. (১৩৯৩ হি.) বলেন-

أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِالثَّبَاتِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا مُشِيرًا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلْفَلَاحِ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، أَوْ مُسْتَلْزِمٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ، كَمَا عُلِمَ فِي الْأُصُولِ، فَتَدُلُّ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ عَدَمِ الثَّبَاتِ أَمَامَ الْكُفَّارِ، وَقَدْ صَرَّحَ تَعَالَى بِهَذَا الْمَدْلُولِ فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ.

"আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে কারিমায় মুমিনদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকার এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন; একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, এটা সফলতার মাধ্যম। আর কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেয়ার অর্থ তার বিপরীতটা থেকে নিষেধ করা; অথবা বলা যায়, অবশ্যম্ভাবীভাবেই বিপরীতটা নিষেধ হয়ে পড়ে। যেমনটা উসূল শাস্ত্রে বিধিত। অতএব আয়াতে কারিমা কাফেরদের সামনে দৃঢ়পদ না থাকার নিষেধাজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করছে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টা স্পষ্টভাবেও ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই বাণীতে- 'হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না'।" -আদওয়াউল বায়ান ২/১০১

ইমাম মুসলিম রহ. (২৬১ হি.) সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنّ؟ قَالَ: "الشّرْكُ بِالله. وَالسّحْرُ، وَقَتْلُ النّفْسِ الّتِي حَرّمَ الله إِلاّ بِالْحَقّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرّبَا، وَالتّوَلّي يَوْمَ الزّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ" -

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হতে বিরত থাকবে। আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণ (হত্যা করা) হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মু'মিন নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া।" -সহিহ মুসলিম: ১৪৫

হাদীসে উল্লিখিত **التولي يوم الزحف** তথা 'যুদ্ধের দিন পলায়ন করা' এর ব্যাখ্যায়-

ইমাম নববী রহ (৬৭৬ হি.) বলেন-

وأما عده صلى الله عليه و سلم التولى يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة فى كونه كبيرة الا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر قال والآية الكريمة فى ذلك انما وردت فى أهل بدر خاصة والصواب ما قاله الجماهير أنه باق والله أعلم

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের দিন পলায়ন করাকে কবীরা গুনাহ গণ্য করেছেন, যা কবিরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরামের মতের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ হতে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে এ আয়াতটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সঠিক মত হল যেটি জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, আয়াতের হুকুম এখনও বহাল রয়েছে।" - ইমাম নববী কৃত শরহে মুসলিম ২/৮৮

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন-

فرض عين عند عموم النفير وفرض كفاية في غير تلك الحال وإذا شهد الوقعة فتعين عليه.

"নাফিরে আমের সময় জিহাদ ফরজে আইন। অন্য সময় ফরজে কেফায়া। তবে ময়দানে উপস্থিত হয়ে গেলে ফরজে আইন হয়ে যায়।" -বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯১

ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন-

مَنْ شَرَعَ فِي قِتَالٍ وَلَا عُذْرَ لَهُ، لَزِمَهُ الْمُصَابَرَةُ، وَعَبَّرَ الْأَصْحَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْجِهَادَ يَصِيرُ مُتَعَيَّنًا عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِالشُّرُوعِ

"যে ব্যক্তি যুদ্ধ শুরু করে দেবে এবং তার কোনো ওজর থাকবে না, তার জন্য অটল থাকা আবশ্যক। আমাদের উলামায়ে কেরাম বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে- যাদের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া, তাদের উপরও জিহাদ শুরু করার দ্বারা ফরজে আইন হয়ে যায়।" –রওযাতুত্তালিবীন ১০/২১৩

দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলে বা আক্রমণে উদ্ধত হলে

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল, কাফেররা যখন মুসলমানদের কোনো এলাকায় আক্রমণ করে অথবা কোনো এলাকা দখল করে নেয় কিংবা আক্রমণে উদ্ধত হয়। তখন উক্ত এলাকার অধিবাসীদের সকলের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল; যখন তিনি ছিলেন দু’জনের দ্বিতীয় জন। যখন তাঁরা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন’। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।” –(সূরা তাওবা : ৩৮-৪১)

মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ: (৫৮৭ হি.) বলেন-

فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {انفروا خفافا وثقالا} قيل: نزلت في النفير.

“যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; অর্থাৎ কোনো এলাকায় শত্রুরা আক্রমন চালায়, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ফরজ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর বর্তায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী, ‘তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক,

জিহাদে বের হও' বলা হয়, আয়াতটি নাফিরে আম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।" - বাদায়িউস সানায়ি': ৭/৯৮

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন-

وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: الرابعة- وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاور هم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا.

"কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। চতুর্থ মাসআলায় এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উক্ত অবস্থা হল, যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারী (সরঞ্জামধারী), যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ, শত্রুর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক, জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে

অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ, শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।" -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২

ইমাম কুরতুবী রহ. -এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন।

১. যখন শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয়। **(بغلبة العدو على قطر من الأقطار)**

২. যদি শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। **(بحلوله بالعقر)**

৩. যদি শত্রু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের দিকে আসতে থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে। **(لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها)**

এই সকল সূরতে জিহাদ ফরজে আইন। তা বহাল থাকবে যতক্ষণ না শত্রুকে পূর্ণ পরাস্ত করা যায় এবং দারুল ইসলাম থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা যায়।

হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا) -

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।" –সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩

الاسْتِنْفار অর্থ: জিহাদ ও নুসরতে বের হওয়ার আহবান জানানো।

ইমাম সুয়ূতী রহ. (মৃত্যু: ৯১১ হি.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

أى إذا طلب منكم الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه.

"অর্থাৎ যখন তোমাদের কাছে তলব করা হয়, তোমরা জিহাদে বের হও, তখন বের হয়ে পড়।" -জামিউল আহাদীস: ১৩৩৮

তিনি আরো বলেন-

الِاسْتِنْفَارُ: الِاسْتِنْجَادُ وَالِاسْتِنْصَارُ، وَالْمُرَادُ: إِذَا طُلِبَ مِنْكُمُ النُّصْرَةُ فَأَجِيبُوا وَانْفِرُوا خَارِجِينَ إِلَى الإِعَانَةِ.

অর্থ: সাহায্য ও নুসরত কামনা করা। উদ্দেশ্য, যখন তোমাদের কাছে নুসরত চাওয়া হয়, তখন সাড়া দাও এবং নুসরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়।" -জামিউল আহাদীস: ১৩৩৮

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু: ৮৫২ হি.) বলেন–

المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه وفسره بقوله (فإذا استنفرتم فانفروا) أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا.

"উক্ত হাদীসের অর্থ হল, মক্কা বিজিত হয়ে দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার দ্বারা মক্কা থেকে হিজরত করার ফরজিয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় জিহাদে বের হওয়া তেমনি ফরজ রয়ে গেছে, যেমন আগে ফরজ ছিল। (**فإذا استنفرتم فانفروا**) দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যখনই তোমাদের জিহাদের জন্য আহবান করা হবে, তোমরা সাড়া দেবে।" - ফাতহুল বারী: ১৫/৭৮

কাজি ইয়ায রহ. (মৃত্যু: ৫৪৪ হি.) বলেন–

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) هو على وجهين؛ فأما الاستنفار لعدو صدم أرض قوم، فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم، وكذلك لكل عدو غالب ظاهر حتى يقع، وأما لغير هذين الوجهين فيتكد النفير لطاعة الإمام لذلك، ولا يجب وجوب الأول.

"(**وإذا استنفرتم فانفروا**) তথা 'যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়' -এর দু'টি সূরত রয়েছে। যদি এমন কোনো শত্রু প্রতিহত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন। একইভাবে যে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রতিহত করার জন্যে জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়। এই দুই সূরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের জন্য জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দু'টির মতো জোরদার ফরজ নয়।" -ইকমালুল মু'লিম: ৬/২৭৫

এই পরিস্থিতিকে ফিকহের পরিভাষায় নাফিরে আম বলা হয়। নাফির অর্থ যুদ্ধে বের হওয়া, আর আম অর্থ ব্যাপক। 'নাফিরে আম' দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যখন

শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সকলের জিহাদে বের হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে যেহেতু তাদের প্রতিহত করতে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে জিহাদে বের হতে হয়, তাই এ অবস্থাকে নাফিরে আম বলা হয়। নাফীরে আমের অবস্থায়ও সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন।

আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

وَفَرْضُ عَيْنٍ إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَيَخْرُجُ الْكُلُّ.

"শত্রু আকস্মিক হামলা করে বসলে জিহাদ ফরজে আইন। তখন সকলেই জিহাদে বের হয়ে পড়বে।"

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২ হি.) উক্ত বক্তব্যের ব্যখ্যায় বলেন-

وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى "النَّفِير الْعَامّ". قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ: وَالنَّفِيرُ الْعَامُّ – أَنْ يُحْتَاجَ إلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.

"এ অবস্থাকে 'নাফিরে আম' বলা হয়। 'আল-ইখতিয়ার' গ্রন্থকার বলেন, 'নাফিরে আম' হচ্ছে এমন অবস্থা, যখন সকল মুসলমানের জিহাদে বের হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।" –রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

يجب الجهاد على الكفاية إلا إذا كان النفير عاماً بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين ... فيفترض على كل واحد.

"জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে নাফিরে আম হয়ে গেলে সকলের উপর ফরজ হয়ে যায়। নাফিরে আম হল, যখন কাফেররা আক্রমণ করে বসে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করা যায় না।... তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।" –আলবিনায়া:৭/৯৬

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাফেররা আক্রমণ করে বসলে বা কোনো ভূখণ্ড দখল করে নিলে এক পর্যায়ে দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, সর্বপ্রথম তাদের উপর ফরজে আইন। তারা না পারলে বা না করলে, এই দায়িত্ব তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর বর্তায়। তারা না পারলে বা না করলে তাদের পরবর্তীদের উপর বর্তায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া ফরজে আইন হয়ে

যায়। এ অবস্থায় প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে শরীক হবে। অন্যথায় সবাই ফরজ ত্যাগের দায়ে গুনাহগার হবে।

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج.

"যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ওইসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন সালাত ও সিয়াম ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকবে না। এভাবে তাদের পরবর্তী এবং তাদের পরবর্তী মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।" -রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

উল্লেখ্য, কোনো মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার জন্যও এক পর্যায়ে ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদকে ফরজে আইন বলেছেন। স্বভাবত এখানেও সেই বিন্যাস প্রযোজ্য, যা উপরে রদ্দুল মুহতারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হল।

ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫ হি.) বলেন-

ولو أسروا مسلما أو مسلمين فهل يتعين القتال كما لو استولوا على الديار فيه خلاف والظاهر أنه يتعين إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل في ديارهم ويحتاج إلى زيادة أهبة فقد رخص فيه في نوع من التأخير ولكن لا يجوز إهماله.

"কাফিররা যদি দুয়েকজন মুসলিমকে বন্দী করে, তাহলে কি কিতাল ফরজে আইন হয়ে যাবে? যেমন তারা মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব কায়েম করলে ফরজে আইন হয়ে যায়? এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। তবে স্পষ্ট এটাই যে, (তাদের বিরুদ্ধে

কিতাল করা) সম্ভব হলে ফরজে আইন হয়ে যাবে। তবে তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে আক্রমণ করা কঠিন হলে এবং অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হলে, বিলম্ব করার কিছুটা সুযোগ আছে। কিন্তু একদম উপেক্ষা করা জায়েয নয়।" –আলওয়াসিত:৭/৫

তিন. ইমাম কাউকে জিহাদের নির্দেশ দিলে

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার তৃতীয় ক্ষেত্র হল, ইমামুল মুসলিমীনের আদেশ। তিনি যাদেরকে জিহাদে যেতে নির্দেশ দিবেন, তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম হল, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সঙ্গে বছরে অন্তত এক দুইবার জিহাদ করা ফরজে কেফায়া (অবশ্য এতে কারো কারো দ্বিমতও আছে)। যাতে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং কখনো মুসলমানদের উপর আক্রমণের সাহস না করে। এ জিহাদ যেহেতু ফরজে কেফায়া, এজন্য সকলেরই এ জিহাদে বের হওয়া না হওয়ার এখতিয়ার থাকে। কিন্তু ইমামুল মুসলিমীন যদি এ জিহাদের জন্য কিছু মুসলমানকে নির্ধারিত করে দেন, তাহলে তাদের জন্য তখন জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।" – (সূরা তাওবা: ৩৮-৪১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন-

لو استنفرهم الإمام مع كفاية من في وجه العدو من أهل الثغور وجيوش المسلمين لأنه يريد أن يغزو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر من المسلمين أن ينفروا.

"শত্রুদের মুখোমুখি অবস্থানরত সীমান্ত প্রহরী এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও যদি হারবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের ভূমিতে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ইমামুল মুসলিমীন মুসলমানদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দেন, তাহলে তাদের উপর ফরজ, যুদ্ধে বের হওয়া।" -আহকামুল কুরআন: ৪/৩১১

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন-

إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام.

"তবে ইমাম কোনো দলকে নির্ধারণ করে দিলে এবং জিহাদে যেতে আহ্বান করলে, তাদের জন্য পেছনে থেকে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইমামের নির্ধারণের দ্বারা, যাকে তিনি নির্ধারণ করেছেন, তার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। এটা জিহাদ ফরজ হওয়ার কারণে নয়, ইমামের আনুগত্যের কারণে।" –তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৪২

হাদীসে এসেছে-

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.

"(মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহ্বান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।" –সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩

এ হাদীসে যখনই জিহাদের আহ্বান আসবে, তখনই বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। কাফেররা আক্রমণ করে বসলে যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ আহ্বান এসে যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকে, তখন ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও এ আহ্বান আসতে পারে। উভয় সূরতেই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন–

وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام

"উক্ত হাদীস একথার দলিল যে, ইমামুল মুসলিমীন যাকে যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত করবেন, তার জন্য যুদ্ধে বের হওয়া ফরজ।" -ফাতহুল বারী: ৬/৩৯

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.) বলেন-

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا)؛ أي: طَلَب منكم الإمام النَّفير. وهو: الخروج إلى الغزو، فحينئذ يتعيَّن الغزو على من استُنفر بلا خلاف.

"আল্লাহ তাআলার বাণী, 'যখন তোমাদের বের হতে বলা হয় তখন তোমরা বের হও'। অর্থাৎ ইমাম যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আদেশ করেন (তখন জিহাদে বের হয়ে যাও) । এমতাবস্থায় যাদের বের হতে বলা হবে, তাদের জন্য বের হওয়া ফরজে আইন। এতে কারো দ্বিমত নেই।" –আলমুফহিম: ১১/১৮

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন-

وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج.

“ইমাম যদি লোকদের জিহাদে বের হওয়ার আহবান করেন, তাহলে তাদের উপর আবশ্যক, জিহাদে বের হওয়া এবং ইমামের অবাধ্য না হওয়া।” –শরহুসসিয়ারিল-কাবির: ১/১৮৯

আল্লামা আবুল কাসিম গারনাতি মালেকী রহ. (৭৪১ হি.) বলেন-

وَيتَعَيَّن لثَلَاثَة أَسبَاب (أَحدهَا) أَمر الإِمَام فَمن عينه الإِمَام وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج.

তিন কারণে ফরজে আইন হয়। তন্মধ্যে একটি হল, ইমাম কর্তৃক জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান। ইমাম জিহাদে বের হওয়ার জন্য যাকে নির্দিষ্ট করবেন, তার জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজ।” –আলকাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ: ১/৯৭

আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬৮২ হি.) বলেন-

إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه

“ইমাম কোনো কওমকে জিহাদে বের হতে বললে, ইমামের সঙ্গে তাদের বের হওয়া ফরজ।”–আশশরহুল কাবীর:১০/৩৬৮

জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে নয়

সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে। [ফিক্বহুসসুন্নাহ৩/৮৫]

জিহাদ ফরয নয় কোন অমুসলিমের উপর, দুর্বলের উপর, নারী ও রোগীর উপর, শিশু ও পাগলের উপর। এইসব লোকদের কেউ জিহাদ থেকে দূরে থাকলেও তাদের উপর কোন দোষ বর্তাবে না। বরং জিহাদে এদের উপস্থিতি উপকারের চাইতে ক্ষতির কারণ বেশী হবে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا ۚ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ... ۝

‘দুর্বলদের উপর, রোগীদের উপর, ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের উপর (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) কোন দোষ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুরাগ পোষণ করে’... (তওবাহ-৯১)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওহোদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকটে গেলাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। [বুখারী ও মুসলিম; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।] কেননা জিহাদ একটি ইবাদত, যা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্যদের উপরে ফরয নয়। [ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।]
হযরত আয়েশা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েদের জন্য কি জিহাদ নেই? রাসূল (ছাঃ) বললেন, অবশ্যই আছে। তবে সে জিহাদে ক্বিতাল নেই (অর্থাৎ পরস্পরে যুদ্ধ নেই) । সেটি হ’ল হজ্জ ও ওমরাহ’। [আহমাদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২৫৩৪।]

রাসূল ﷺ এর যুগে জিহাদ

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরব সমাজ ছিল গোত্রভিত্তিক, এবং সেখানে যুদ্ধ ছিল একটি সাধারণ সামাজিক বাস্তবতা। এই যুদ্ধগুলো সাধারণত ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিতে নয়, বরং প্রতিশোধ, ক্ষমতা বিস্তার এবং সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হতো। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, অনিরাপত্তা এবং
অবিচার ছিল ব্যাপক।

মাক্কী জীবনে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না।আল্লাহ বলেন

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, “তোমরা তোমাদের হাত সংযত করো, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও?” তারপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হল, অমনি তাদের মধ্যে একটি দল মানুষকে ভয় করতে লাগল, ঠিক আল্লাহকে ভয় করার মত কিংবা তার চেয়েও বেশি। তারা বলতে লাগল, “হে আমাদের প্রভু! কেন তুমি আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে? আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে না কেন?” বলে দাও, “এ জগতের ভোগ তো সামান্য। মোত্তাকীদের জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদেরকে সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।” (নিসা ৪/৭৭) । এই নীতি সর্বদা প্রযোজ্য। যখন কুফরী শক্তি প্রবল হবে এবং ইসলামী শক্তি তার তুলনায় দুর্বল থাকবে।

অতঃপর দেশ থেকে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মত চূড়ান্ত যুলুমের অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে। বলা হয়, **أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ-**‘যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ’ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) সাহায্য করতে সক্ষম’ (হাজ্জ ২২/৩৯) ।

এ সময় কেবল যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়,

۝ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আর সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (বাক্বারাহ ২/১৯০) । অর্থাৎ স্রেফ পরকালীন স্বার্থেই জিহাদ হবে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয় এবং যারা যুদ্ধ করে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে।

যুদ্ধকালে নির্দেশ দেওয়া হয়,

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ ۝

‘তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ কর, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না’। [মুসলিম হা/১৭৩১; আহমাদ হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৩৯২৯।]

অতঃপর কুফরী শক্তির সর্বব্যাপী হামলা থেকে দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে মৌলিক নির্দেশনা জারী করা হয়,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাতে কোন ফেতনা না থাকে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর হয়ে যায়। আর তারা যদি বিরত হয় তাহলে জালেমদের ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন বৈরিতা নেই। (বাক্বারাহ ২/১৯৩)

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যাতে ফেতনা (শিরক, কুফর ইত্যাদি অধর্ম) না থাকে আর দ্বীন (এবাদত) সামদ্বিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি তারা (অন্যায় থেকে) বিরত হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাদের (এ) কাজ দেখতে পান। (আনফাল ৮/৩৯) ।

সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় ‘তাওহীদের ঝান্ডা উঁচু থাকবে ও শিরকের ঝান্ডা অবনমিত হবে’ মর্মে জিহাদের চিরন্তন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

যেমন আল্লাহ বলেন,

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

তোমরা যদি তাকে (রসূলকে) সাহায্য না করো তবে (তার কোন অসুবিধা হবে না, কারণ) আল্লাহ তো তাকে তখনও সাহায্য দ্বিতীয়জন, যখন তারা দুজন গুহায় ছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, "চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন।" অতঃপর আল্লাহ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করেছেন, তোমরা দেখনি এমন সেনাদল (ফেরেশতাদের) দিয়ে তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন এবং কাফেরদের কথা হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত (রয়েছে)। আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। (তওবা ৪০)

যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং আল্লাহর দ্বীনকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, সেইসব কাফের অপশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। যেমন আল্লাহ বলেন,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পরিপূর্ণ করবেন, কাফেররা (তা) অপছন্দ করলেও। (ছফ ৬১/৮-৯;)

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

তারা চায় মুখ দ্বারা (ফুঁ দিয়ে) আল্লাহর (তওহীদের) আলো নিভিয়ে দিতে; কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোর পূর্ণতাদান ছাড়া আর কিছু হতে দেবেন না, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (তওবাহ ৯/৩২)

কোন মুসলিম যদি কুফরী শক্তির দোসর হিসাবে কাজ করে, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে 'কঠোর' হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে নবী! কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের নিবাস হল জাহান্নাম, বড় খারাপ ঠিকানা! (তওবা ৯/৭৩)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

হে নবী! কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না খারাপ গন্তব্য! (তাহরীম ৬৬/৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'।[ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৩ আয়াত।] মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ﷺ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।[মুসলিম হা/২৫৬৪; বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪ (১১৬); মিশকাত হা/৪৮১৪।] কোন কারণে যুদ্ধ লাগলে অন্যদের দায়িত্ব হবে উভয় পক্ষকে থামানো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া'

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

যদি মুমিনদের দুটি দল মারামারি করে তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়) । যদি ফিরে আসে তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ তো সুবিচারকারী-দেরকেই ভালবাসেন। (হুজুরাত ৪৯/৯)

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, **يَمْنَعُنِى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِى**'আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন'। লোকেরা বলল, আল্লাহ কি বলেননি, **وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ ِللهِ**'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' (বাক্বারাহ ২/১৯৩)। জবাবে তিনি বলেন, **قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ ِللهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ**'আমরা যুদ্ধ করেছি যাতে ফিৎনা (শিরক ও কুফর) না থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তোমরা যুদ্ধ করছ যাতে ফিৎনা (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (শত্রুর) জন্য হয়ে যায়' (বুখারী হা/৪৫১৩)। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, **هَلْ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى**

الْمُلْكِ‘তুমি কি জানো ফিৎনা কি? মুহাম্মাদ (ﷺ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ নয়’ (বুখারী হা/৪৬৫১, ৭০৯৫) ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ... وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ**‘সত্বর তোমাদের মধ্যে ফিৎনাসমূহ সৃষ্টি হবে। তখন তোমাদের মধ্যেকার বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং বসা ব্যক্তি হাঁটা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর হাঁটা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যদি কেউ আশ্রয়স্থল বা বাঁচার কোন স্থান পায়, তবে সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়’।[বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৬ (১০); মিশকাত হা/৫৩৮৪।] ফিৎনার সময় করণীয় প্রসঙ্গে হযরত সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, كُنْ كَابْنِ آدَمَ‘তুমি আদমের পুত্রের মত হও’ (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর) । অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন’। যেখানে হত্যাকারী ক্বাবীলের বিরুদ্ধে হাবীলের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন,

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْکَ لِاَقْتُلَکَ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

“তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না; (কারণ) আমি তো সারা জাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।” (মায়েদাহ ৫/২৮) । [আহমাদ হা/১৬০৯; আবুদাঊদ হা/৪২৫৭ ‘ফিতান’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ।] আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যখন তোমাদের কারু গৃহে ফেৎনা প্রবেশ করবে, তখন সে যেন আদমের দুই পুত্রের উত্তমটির মত হয়(**فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ**)।[আবুদাঊদ হা/৪২৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১ সনদ ছহীহ।]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব যুদ্ধে নিজে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন। সেসব যুদ্ধকে “গাযওয়া” বলা হয়।

মূসা বিন উকবা, মুহাম্মদ বিন ইসহাক, ওয়াকিদী, ইবনে সা’দ, ইবনুল জাওযী এবং দিময়াতী ইরাকী প্রমূখদের মতে “গাযওয়া” এর সংখ্যা ২৭টি।

আর হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব রাঃ থেকে ২৪টি, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে ২১টি আর যায়েদ বিন আরকাম রাঃ থেকে ১৯টির কথা বর্ণিত হয়েছে। [সীরাতে মুস্তাফা-২/৪৩]

তবে সবচে' গ্রহণীয় কওল ২৭টি।

সারিয়্যা এর সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে।

ইবনে সা'দ থেকে ৪০টি, ইবনে আব্দিল বার থেকে ৩৫টি, মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে ৩৮টি, ওয়াকেদী থেকে ৪৮টি এবং ইবনুল জাওযী থেকে ৫৬টির কথা বর্ণিত হয়েছে। [সীরাতে মুস্তাফা-২/৪৩]

১ম হিজরীর রামাযান হ'তে ১১ হিজরীর ছফর পর্যন্ত

১। সারিইয়াতু সীফিল বাহর (سرية سيف البحر) : মদীনায় হিজরতের ৭ মাসের মাথায় ১ম হিজরীর রামাযান মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নেতৃত্বে ৩০ জনের মুহাজির বাহিনী। প্রতিপক্ষে ছিল আবু জাহলের নেতৃত্বে ৩০০ জনের একটি সিরিয়া ফেরত বাণিজ্য কাফেলা। লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' (العيص) নামক স্থানে মুখোমুখি হ'লেও যুদ্ধ হয়নি। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সূরা হজ্জ ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয়।

২। সারিইয়াতু রাবেগ (سرية رابغ) : ১ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ ইবনুল মুত্ত্বালিব-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের মুহাজির বাহিনী। প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জনের বাণিজ্য কাফেলা। রাবেগ নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলায় কিছু তীর নিক্ষেপ ব্যতীত আর কিছু হয়নি। তবে মাক্কী বাহিনীতে লুকিয়ে থাকা দু'জন মুসলমান মিক্বদাদ বিন আমর বুহরানী এবং উৎবাহ বিন গাযওয়ান মাযেনী মুসলিম বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন।

৩। সারিইয়াতুল খাররার (سرية الخرار) : ১ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছের নেতৃত্বে জুহফার নিকটবর্তী খাররার নামক স্থানে ২০ জনের মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। কিন্তু কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা আগের দিন চলে যাওয়ায় সাক্ষাৎ মেলেনি।

৪। গাযওয়া ওয়াদ্দান (غزوة ودَّان) : ২য় হিজরীর ছফর মাসে (৬২৩ খৃঃ আগষ্ট মাস)

রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কুরায়েশ কাফেলার বিরুদ্ধে পরিচালিত ৭০ জনের মুহাজির বাহিনী। যুদ্ধ হয়নি। তবে স্থানীয় বনু যামরাহ গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটাই ছিল রাসূলের জীবনে প্রথম যুদ্ধাভিযান। এই সফরে তিনি ১৫ দিন অতিবাহিত করেন। পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রাঃ)।

৫। গাযওয়া বুওয়াত্ব (غزوة بواط) : ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে রাসূলের নেতৃত্বে ২০০ জনের বাহিনী। প্রতিপক্ষে ছিল উমাইয়া বিন খালাফের নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি বাণিজ্য কাফেলা। যাতে ছিল ২৫০০ উট। সংঘর্ষ হয়নি।

৬। গাযওয়া সাফওয়ান (غزوة سفوان) : ২য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাসূলের নেতৃত্বে ৭০ জনের দল। প্রতিপক্ষ মক্কার নেতা কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী পালিয়ে যায়। সে ছিল মদীনার উপকণ্ঠে প্রথম হামলাকারী এবং গবাদি-পশু লুটকারী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই লুটেরাদের ধাওয়া করে বদরের উপকণ্ঠে সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত গমন করেন। এজন্য এই অভিযানকে গাযওয়া বদরে ঊলা বা প্রথম বদর যুদ্ধ বলা হয়।

৭। গাযওয়া যিল উশাইরাহ (غزوة ذي العشيرة) : ২য় হিজরীর জুমাদাল ঊলা ও আখেরাহ মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাসূলের নেতৃত্বে ১৫০/২০০ লোকের বাহিনী। সিরিয়া যাত্রী কুরায়েশ কাফেলা নাগালের বাইরে চলে যায়। এই কাফেলাটিকে মক্কায় ফেরার পথে আটকানোর জন্য রামাযানের ৮ অথবা ১২ তারিখে আল্লাহর রাসূল মদীনা থেকে বের হন, যা পরে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য হয়। এই অভিযানে বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনু যামরাহর সাথে ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৮। সারিইয়াহ নাখলা (سرية نخلة) : ২য় হিজরীর রজব মাসে। আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে মাত্র ১২ জনের একটি ছোট্ট দল। কুরায়েশ পক্ষের বাণিজ্য কাফেলার নেতা আমর ইবনুল হাযরামী নিহত ও ২ জন বন্দী হয়। এটাই ছিল ইসলামে প্রথম নিহত ও প্রথম দুই বন্দী। গনীমতের মালামাল সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন। কিন্তু হারাম মাসের শেষ দিন হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রক্তমূল্য দেন এবং বন্দীদের মুক্তি দেন। এ প্রসঙ্গে

বাক্বারাহ ২১৭ আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। তবে আল্লাহর পথে বাধা দান ও মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দান এবং তার বাসিন্দাদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকটে তদপেক্ষা বড় অন্যায়। এই যুদ্ধে নিহতের বদলা নিতেই আবু জাহল বদরে এসেছিল। এই অভিযান শেষে শা'বান মাসে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয হয় (বাক্বারাহ ২/১৯০-৯৩; মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭, ২০)।

৯। গাযওয়ায়ে বদর (غزوة بدر الكبرى) : ২য় হিজরীর ১৭ রামাযান মোতাবেক ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ শুক্রবার। রাসূল (ﷺ)-এর নেতৃত্বে ৩১৩, ১৪ বা ১৭ জনের অপ্রস্তুত বাহিনী। কুরায়েশ পক্ষে আবু জাহলের নেতৃত্বে ১০০০ লোকের সুসজ্জিত বাহিনী। মুসলিম পক্ষে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার সহ ১৪ জন শহীদ এবং কুরায়েশ পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। আবু জাহল সহ নিহতদের অধিকাংশ ছিল মক্কার শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। বদর যুদ্ধ উপলক্ষে সূরা আনফাল নাযিল হয়। যাতে গনীমতের বিধান বর্ণিত হয়।

১০। সারিইয়াহ ওমায়ের ইবনুল আদী আল-খুত্বামী (عمير بن العدي الخطمى) : ২য় হিজরীর রামাযান মাসে। একাকী স্বীয় সম্পর্কিত বোন আছমা (عصماء) বিনতে মারোয়ান খুত্বামিয়াকে হত্যা করেন। কেননা মহিলাটি সর্বদা তার গোত্রকে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিত। ওমায়ের ছিলেন তার গোত্রের প্রধান এবং সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী। তার পিতা আদী বিন খারশাহ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

১১। সারিইয়াহ সালেম বিন ওমায়ের আনছারী (سالم بن عمير) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। একাকী জনৈক ইহুদী আবু ওকফা **(ابو عكفه)** -কে হত্যা করেন। কারণ সে সর্বদা অন্য ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উষ্কানী দিত।

১২। গাযওয়া বনু সুলায়েম (غزوة بني سليم) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ হ'তে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাতদিন পরে সংঘটিত হয়। বনু গাত্বফান গোত্রের শাখা বনু সুলায়েম মদীনা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে জানতে পেরেই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বয়ং

২০০ উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথে কুদর (الكدر) নামক ঝর্ণাধারার নিকটে পেঁŠছে তাদের উপরে আকস্মিক হামলা চালান। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ৫০০ উট রেখে পালিয়ে যায়। ইয়াসার (يسار) নামে একটি গোলাম আটক হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মুক্ত করে দেন।

১৩। গাযওয়া বনু কায়নুক্বা (غزوة بني قينقاع) : ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল শনিবার থেকে ১৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই প্রথম চুক্তি ভঙ্গকারী এবং তাদের বাজারে এক দুধ বিক্রেতা মুসলিম মহিলাকে বিবস্ত্রকারী এই নরাধম ইহুদী গোত্রটি ১লা যিলক্বা'দ আত্মসমর্পণ করে। এরা ছিল খায়বার গোত্রের মিত্র। ফলে মাত্র একমাস পূর্বে ইসলাম কবুলকারী খাযরাজ গোত্রভুক্ত মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের একান্ত অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের প্রাণদন্ড মওকুফ করে মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে ৭০০ জন ছিল সশস্ত্র যোদ্ধা এবং মদীনার সেরা ইহুদী বীর। এরা সবকিছু ফেলে সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ সেখানে মৃত্যুবরণ করে। মানছূরপুরী বলেন, তারা খায়বরে যেয়ে বসতি স্থাপন করে। [রহমাতুল লিল আলামীন ১/১৩০।]

১৪। গাযওয়া সাভীক্ব (غزوة سويق) : ২য় হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে। বদর যুদ্ধের মন্দ পরিণতিতে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান শপথ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার মস্তক নাপাকীর গোসলের পানি স্পর্শ করবে না। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তিনি ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে মদীনায় এসে ইহুদী গোত্র বনু নাযীর নেতা ও তাদের কোষাধ্যক্ষ সালাম বিন মুশকিমের সঙ্গে শলা পরামর্শ শেষে ফিরে যান। কিন্তু যাওয়ার আগে একটি দল পাঠিয়ে দেন। যারা মদীনার আরীয (العريض) নামক স্থানে হামলা করে কয়েক সারি খেজুর গাছ কেটে জ্বালিয়ে দেয় এবং একজন আনছার ও তার এক মিত্রকে তাদের জমিতে কর্মরত পেয়ে হত্যা করে ফিরে যায়।

এখবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দ্রুত গতিতে পশ্চাদ্ধাবন করেন। আবু সুফিয়ান ভয়ে এত দ্রুত পলায়ন করেন যে, বোঝা হালকা করার জন্য তাদের পাথেয় সম্ভার এবং ছাতুর অনেকগুলি বস্তা রাস্তায় ফেলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্বারক্বারাতুল কুদর

(قرقرة الكدر) পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরবার পথে তাদের ফেলে যাওয়া ছাতুর বস্তাগুলো নিয়ে আসেন। ছাতুকে আরবীতে 'সাভীক্ব' **(السويق)** বলা হয়। সেজন্য এই অভিযানটি 'গাযওয়া সাভীক্ব' বা ছাতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছে।

১৫। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে আগ্রাসী বনু সুলায়েম বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় ফিরে আসার পর শত্রুরা পুনরায় সংগঠিত হয়েছিল। তখন এদের বিরুদ্ধে পুনরায় এই অভিযান প্রেরিত হয়। যাতে শত্রুপক্ষের কয়েকজন এবং মুসলিম পক্ষের তিন জন মারা যায়।

১৬। গাযওয়া যী আমর (غزوة ذي أمر) : ৩য় হিজরীর ছফর মাস। বনু ছা'লাবাহ ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমন করবে এ মর্মে খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৪০০ সৈন্য নিয়ে তাদের মুকাবিলায় বের হন। পথিমধ্যে বনু ছা'লাবাহ গোত্রের জাববার **(جبار)** নামক জনৈক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ঘাঁটি এলাকায় পৌঁছে যী আমর **(ذي أمر)** নামক ঝর্ণাধারার পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে পুরা ছফর মাস অতিবাহিত করেন। যাতে মুসলিম শক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি শত্রুদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

১৭। সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ : ৩য় হিজরীর ১৪ রবীউল আউয়াল। মদীনার নামকরা ইহুদী পুঁজিপতি ও কবি কা'ব বিন আশরাফ সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিত। বদর যুদ্ধের পর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ নেতাদের উস্কে দেয়। তারপর মদীনায় ফিরে এসে ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলতে থাকে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সেমতে আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল ১৪ই বরীউল আউয়াল চাঁদনী রাতে তার বাড়ী গিয়ে তাকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর ইহুদীরা সম্পূর্ণরূপে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং রাসূলের সাথে পূর্বের কৃত চুক্তি মোতাবেক আচরণ করার স্বীকৃতি প্রদান করে। এর

ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা হ'তে মুক্ত হন এবং বহিরাক্রমণ মুকাবিলার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান।

১৮। গাযওয়া বাহরান (غزوة بحران) : ৩য় হিজরীর রবীউল আখের মাসে। একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলাকে আটকানোর জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ৩০০ সৈন্য নিয়ে হেজাযের ফারা **(الفرع)** সীমান্তের বাহরান অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে তিনি রবীউল আখের ও জুমাদাল ঊলা দু'মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি।

১৯। সারিইয়া যায়েদ ইবনু হারেছাহ : ৩য় হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। মদীনার পথে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পূর্বদিক দিয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে সম্পূর্ণ অজানা পথে নাজদ হয়ে সিরিয়া যাবার মনস্থ করে। এ খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে 'ক্বারদাহ' **(قردة)** নামক প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিতে এই হামলার মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে কাফেলা নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া সবকিছু ফেলে পালিয়ে যান। কুরায়েশদের পথ প্রদর্শক ফুরাত বিন হাইয়ান **(فرات بن حيان)** এবং বর্ণিত হয়েছে যে, আরও দু'জন বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয়। অতঃপর তারা রাসূলের হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন। আনুমানিক এক লক্ষ দেরহামের রৌপ্য সহ বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত হয়। এই পরাজয়ে কুরায়েশরা হতাশ হয়ে পড়ে। এখন তাদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা রইল। অহংকার পরিত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করা অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য, তারা শেষটাই গ্রহণ করে এবং যা ওহোদ যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

২০। গাযওয়া ওহোদ (غزوة الأحد) : ৩য় হিজরীর ৭ই শাওয়াল শনিবার সকাল। কুরায়েশ বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনার তিন মাইল উত্তরে ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করে। এই বাহিনীর সাথে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওৎবার নেতৃত্বে ১৫ জনের একদল মহিলা ছিল, যারা নেচে-গেয়ে ও উত্তেজক কবিতা পাঠ করে তাদের সৈন্যদের

উৎসাহিত করে। এই যুদ্ধে রাসূলের নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ সৈন্য ছিলেন। প্রচন্ড যুদ্ধ শেষে একটি ভুলের জন্য মুসলমানদের সাক্ষাৎ বিজয় অবশেষে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম পক্ষে ৭০ জন শহীদ ও ৪০ জন আহত হন। কুরায়েশ পক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়। যাদের মধ্যে হামযা একাই ৩১ জনকে হত্যা করেন ও নিজে শহীদ হন। মুসলমানদের ক্ষতি হ'লেও কুরায়েশরা বিজয়ী হয়নি। বরং তারা ভীত হয়ে ফিরে যায়। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১২১-১৭৯ পর্যন্ত ৬০টি আয়াত নাযিল হয়।

২১। গাযওয়া হামরাউল আসাদ (غزوة حمراء الأسد) : ৩য় হিজরীর ৮ই শাওয়াল। আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় মদীনা আক্রমণ করতে পারে, এই আশংকায় ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে হামরাউল আসাদে পৌঁছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। সেখানে মা'বাদ আল-খুযাঈ ইসলাম কবুল করলে তাকে পাঠানো হয় আবু সুফিয়ানের কাছে। মক্কার পথে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছে আবু সুফিয়ান পুনরায় মদীনা আক্রমণের অভিসন্ধি করেছিল। কিন্তু মা'বাদের কূটনীতিতে এবং মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের কথা শুনে তারা ভীত হয়ে দ্রুত মক্কায় ফিরে যায়। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে। এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সূরা আলে ইমরান ১৭৩-৭৪ আয়াতে। এ সময় হামরাউল আসাদে আবু সুফিয়ানের দু'জন গুপ্তচর আবু উযযা জামহী ও মু'আবিয়া বিন মুগীরা গ্রেফতার হয় ও পরে নিহত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিল পরবর্তীতে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নানা।

২২। সারিইয়া আবু সালামা (سرية أبي سلمة) : ৪র্থ হিজরীর ১লা মুহাররম। ত্বালহা ও সালামা বিন খুওয়াইলিদ নামক দুই কুখ্যাত ডাকাত ভাই বনু আসাদ গোত্রকে মদীনা আক্রমণের প্ররোচনা দিচ্ছে মর্মে খবর পৌঁছলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বীয় দুধভাই আবু সালামাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুহাজির ও আনছারের ১৫০ জনের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। বনু আসাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই তাদের 'কুত্বন' **(القطن)** নামক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণের ফলে তারা হতচকিত হয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী তাদের ফেলে যাওয়া উট ও বকরীর পাল ও গনীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। এই যুদ্ধ থেকে ফিরে কিছু দিনের মধ্যে আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামা রাসূলের সাথে বিবাহিতা হন। আবু সালামা ইতিপূর্বে ওহোদের যুদ্ধে যখমী হয়েছিলেন।

২৩। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ বিন আনীস (سرية عبد الله بن أنيس) : ৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম। মুসলমানদের উপরে হামলার জন্য খালেদ বিন সুফিয়ান হুযালী সৈন্য সংগ্রহ করছে বলে সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আব্দুল্লাহ বিন আনীস আল-জুহানী আনছারীকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং অবশেষে খালেদকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে মদীনায় ফেরেন।

২৪। সারিইয়া রাজী‘ (سرية رجيع) : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে আযাল ও ক্বারাহ **(عضل وقارة)** গোত্রের সাতজন লোককে রাসূলের দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। এক্ষণে তাদের অধিক তা‘লীমের প্রয়োজন। সেকারণ কয়েকজন উঁচু মর্তবার ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ’তাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে আছেম বিন ছাবিতের নেতৃত্বে ১০ জন বুযর্গ ছাহাবীকে প্রেরণ করেন। আছেম হযরত ওমরের শ্বশুর ছিলেন এবং আছেম বিন ওমরের নানা ছিলেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী ‘রাজী’ নামক প্রস্রবণের নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা মতে হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদেরকে হামলা করে। যুদ্ধে আছেম সহ আটজন শহীদ হন এবং দু’জনকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তারা হ’লেন হযরত খোবায়েব বিন আদী ও যায়েদ বিন দাছনা। সেখানে ওকবা বিন হারেছ খোবায়েবকে এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়া যায়েদকে হত্যা করে বদর যুদ্ধে তাদের স্ব স্ব পিতৃহত্যার বদলা হিসাবে। শূলে চড়ার আগে খোবায়েব দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, আমি ভীত হয়েছি এই অপবাদ তোমরা না দিলে আমি দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতাম। তিনিই প্রথম এই সুন্নাতের সূচনা করেন। অতঃপর কাফেরদের বদ দো‘আ করেন এবং সাত লাইনের মর্মন্তুদ কবিতা বলেন, যা ছহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীছ ও জীবনী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। খোবায়েবের বদ দো‘আ ছিল নিম্নরূপ- **اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا**- ‘হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে রাখ। তাদেরকে এক এক করে হত্যা কর এবং এদের একজনকেও বাকী রেখো না’। অতঃপর তাঁর সাত লাইনের কবিতার শেষের দু’লাইন ছিল নিম্নরূপ-

ولست أبالى حين أقتل مسلما +على أي شق كان فى لله مصرعي
وذلك في ذات الاله وإن يشاء +يبارك في أوصال شلو ممزع

‘আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে’। ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খন্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন’।[বুখারী হা/৩৯৮৯।] এরপর আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, যে তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে মুহাম্মাদ আসুক এবং তাকে একটি কাটারও আঘাত লাগুক’। হারাম থেকে দূরে তানঈম নামক স্থানে তাকে হত্যা করা হয়। বীরে মা‘উনার মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ছাহাবী আমর বিন উমাইয়া যামরী পাহারাদারকে লুকিয়ে অতীব চতুরতার সাথে তার লাশ এনে সসম্মানে দাফন করেন। অন্যদিকে দলনেতা আছেম-এর লাশ আনার জন্য কুরায়েশ নেতারা লোক পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তার লাশের হেফাযতের জন্য এক ঝাঁক ভীমরুল পাঠান। ফলে মুশরিকরা তার লাশের ধারে যেতে পারেনি। কেননা আছেম আল্লাহর নিকটে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন যে, তাকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। পরে হযরত ওমর বলেন, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে মৃত্যুর পরেও হেফাযত করেন, যেমন তাকে জীবিত অবস্থায় হেফাযত করে থাকেন’।

কুরায়েশরা খোবায়েরকে হারেছ বিন আমেরের বাড়ীতে কয়েকদিন বন্দী রাখে। এ সময় তাকে কোন খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হয়নি। একদিন হঠাৎ হারেছ-এর ছোট বাচচা ছেলে ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে তার কাছে আসে। তিনি তাকে আদর করে কোলে বসান। এ দৃশ্য দেখে বাচ্চার মা চিৎকার করে ওঠে। তখন খোবায়েব বলেন, মুসলমান কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মৃত্যুর পূর্বে খোবায়েবের শেষ বাক্য ছিল- **اللهم بلغنا رسالة فبلغه ما يصنع بنا**- ‘হে আল্লাহ, আমরা তোমার রাসূলের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তুমি তাকে আমাদের খবর পৌঁছে দিয়ো। ওমরের গবর্ণর সাঈদ বিন আমের (রাঃ) যিনি খোবায়েবের মৃত্যু দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের হত্যাকান্ডের দৃশ্য স্মরণ হ’লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহর পথে কতবড় ধৈর্যশীল তিনি ছিলেন যে,

একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। বন্দী অবস্থায় তাঁকে থোকা থোকা আঙ্গুর খেতে দেখা যায়। অথচ ঐসময় মক্কায় কোন ফল ছিল না।

২৫। সারিইয়া বিরে মাঊনা (سرية بئر معونة) : ৪র্থ হিজরীর ছফর মাস। পূর্বোক্ত ঘটনাটির চাইতে এটি ছিল আরও বেশী মর্মন্তুদ এবং দু'টি ঘটনা একই মাসে সংঘটিত হয়। নাজদের নেতা আবু বারা আমের বিন মালেকের আমন্ত্রণক্রমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নাজদবাসীদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুনযির বিন আমের (রাঃ)-এর নেতৃতেব ৭০ জনের একটি দল প্রেরণ করেন। যাদের সকলে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও বিজ্ঞ আলেম। মাঊনা নামক কুয়ার নিকটে পৌঁছলে বনু সুলাইমের তিনটি গোত্র উছাইয়া, রে'ল ও যাকওয়ান **(عصية، رعل و ذكوان)** চতুর্দিক হ'তে তাদের উপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে হত্যা করে। একমাত্র আমর বিন উমাইয়া যামরী রক্ষা পান মুযার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে। এতদ্ব্যতীত কা'ব বিন যায়েদ জীবিত ছিলেন। তাঁকে নিহতদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। পরে তিনি ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের সময় শহীদ হন। এই সময় রাসূলের পত্র বাহক হারাম বিন মিলহানকে প্রাপক গোত্র নেতা আমের বিন তোফায়েল-এর ইংগিতে অতর্কিতে পিছন থেকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করা হ'লে তিনি বলে ওঠেন, **اللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ** 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'। হারাম বিন মিলহানের মৃত্যুকালীন শেষ বাক্যটি হত্যাকারী জাববার বিন সুলমা **(جبار بن سلمى)** -এর অন্তরে এমনভাবে দাগ কাটে যে, পরে তিনি মদীনায় গিয়ে রাসূলের নিকটে ইসলাম কবুল করেন।[রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৪।]

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে পরপর দু'টি হৃদয় বিদারক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দারুনভাবে ব্যথিত হন এবং বনু লেহিয়ান, রে'ল ও যাকওয়ান এবং উছাইয়া গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে এক মাস যাবত বদ দো'আ করে ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন।

২৬। সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (سرية عمرو بن أمية الضمري) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বি'রে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ছাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া যামরী বি'রে মাঊনা হ'তে মদীনায় ফেরার পথে ক্বারক্বারা নামক বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে বনু কেলাব গোত্রের দু'ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সাথীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত

গোত্রের সঙ্গে যে রাসূল (ﷺ)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল, তা তিনি জানতেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে রক্তমূল্য প্রদান করেন। কিন্তু এই ঘটনা পরবর্তীতে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৭। গাযওয়া বনু নাযীর (غزوة بني نضير) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মদীনার মুনাফিক ও মক্কার কুরায়েশ নেতাদের চক্রান্তে বনু নাযীরের ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং রাসূল (ﷺ) তাদের কাছে এলে তারা তাঁকে শঠতার মাধ্যমে বসিয়ে রেখে দেওয়ালের উপর থেকে পাথর ফেলে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তখন সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। অতঃপর ছয় বা পনের দিন অবরোধের পরে তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে মদীনা থেকে চিরদিনের মত বহিষ্কার করা হয় ও তারা খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এ ঘটনা উপলক্ষে সূরা হাশর নাযিল হয়। ইবনু আববাস একে 'সূরা বনী নাযীর' বলতেন। এই যুদ্ধে ফাই-য়ের বিধান নাযিল হয়। মুনাফিকরা বনু নাযীরকে রাসূলের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে সটকে পড়ায় তাদের বিরুদ্ধে সূরা হাশরের ১৬-১৭ আয়াত দু'টি নাযিল হয়।

২৮। গাযওয়া নাজদ (غزوة نجد) : ৪র্থ হিজরীর রবীউল আখের মাস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সংবাদ পেলেন যে, বনু গাত্বফানের দু'টি গোত্র বনু মুহারিব ও বনু ছা'লাবাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেদুঈন ও পল্লীবাসীদের মধ্য হ'তে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নাজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই আকস্মিক অভিযানে উদ্ধত বেদুঈনরা ভয়ে পালিয়ে যায় ও তাদের মদীনা আক্রমণের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

২৯। গাযওয়া বদর আখের (غزوة بدر الآخر) : ৪র্থ হিজরীর শা'বান মোতাবেক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেড় হাযার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। গত বছর ওহোদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান আগামী বছর পুনরায় মদীনা হামলা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। তার হামলা মুকাবিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আগে ভাগেই বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। ওদিকে শত্রুপক্ষের অবস্থা ছিল এই যে, আবু সুফিয়ান ২০০০ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে যথাসময়ে রওয়ানা হয়ে মার্রুয যাহরান পৌঁছে 'মাজিন্নাহ' **(مجنة)** ঝর্ণার নিকটে শিবির স্থাপন করেন।

কিন্তু তিনি যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং বিভিনণ অজুহাত দেখিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চান। তাতে সৈন্যদের সকলে এক বাক্যে সায় দেয় এবং সেখান থেকেই তারা মক্কায় ফিরে যায়।

৮ দিন অপেক্ষার পর শত্রু পক্ষের দেখা না পেয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মদীনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এরি মধ্যে মুসলমানেরা সেখানে ব্যবসা করে দ্বিগুণ লাভবান হন। উল্লেখ্য যে, বদর ছিল অন্যতম বড় ব্যবসা কেন্দ্র। সংঘর্ষ না হ'লেও এই অভিযানকে বদরে আখের বা বদরের শেষ যুদ্ধ বলা হয়। আবু সফিয়ানের পশ্চাদপসারণের ঘটনায় সারা আরবে মুসলিম শক্তির প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।

৩০। গাযওয়া দূমাতুল জান্দাল (غزوة دومة الجندل) : ৫ম হিজরীর ২৫শে রবীউল আউয়াল। খবর এলো যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দাল শহরের একদল লোক সিরিয়া যাতায়াতকারী ব্যবসায়িক কাফেলা সমূহের উপরে লুটপাট চালায়। তারা মদীনায় হামলার জন্য বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কালবিলম্ব না করে ১০০০ ফৌজ নিয়ে মদীনা হ'তে ১৫ রাত্রির পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। কিন্তু শহরে পৌঁছে কাউকে পেলেন না। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন ও চারদিকে ছোট ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুদের কারু নাগাল পাওয়া যায়নি। অবশেষে কিছু গবাদিপশু নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু এতে লাভ হয় এই যে, শত্রুরা আর মাথা চাড়া দেয়নি। তাতে ইসলাম প্রচারের শান্ত পরিবেশ তৈরী হয়। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওয়ায়না বিন হিছন-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেন।

৩১। গাযওয়া আহযাব (غزوة الأحزاب) বা খন্দকের যুদ্ধ : ৫ম হিজরীর শওয়াল ও যুলক্বা'দাহ মাস। বিতাড়িত বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের নেতাদের উস্কানীতে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কেনানাহ ও তেহামার মিত্র গোত্র সমূহ মিলে ৪০০০ কুরায়েশ বাহিনী এবং বনু গাত্বফান ও নাজদীদের ৬০০০ সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনীর ১০,০০০ সৈন্য মদীনা অবরোধ করে। যা ছিল মদীনার মোট লোকসংখ্যার চাইতে বেশী। কিন্তু সালমান ফারেসীর পরামর্শক্রমে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মদীনার উত্তর পার্শ্বে ওহোদের দিকে দীর্ঘ খন্দক বা পরিখা খনন করে তার পিছনে ৩০০০ সৈন্য সমাবেশ করেন। এই নতুন কৌশল দেখে কাফের বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়।

পরিখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে উভয় পক্ষে তীর চালনায় ৬ জন মুসলিম ও ১০ জন কাফির মারা যায়। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় এক মাস অবরোধে খাদ্যকষ্টে পতিত কাফের বাহিনীর উপরে হঠাৎ একরাতে উত্তপ্ত বায়ুর ঝড় নেমে আসে। তাতে তাদের তাঁবু সমূহ উড়ে যায় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে যায়। সম্মিলিত বাহিনীর এই পরাজয়ের ফলে সমগ্র আরবে মদীনা রাষ্ট্রের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভাব্য শত্রুরা মুখ লুকাতে বাধ্য হয়। কেননা আহযাব যুদ্ধের ন্যায় বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো পুনরায় আরবদের জন্য সম্ভবপর ছিল না।

৩২। গাযওয়া বনু কুরায়যা (غزوة بني قريظة) : ৫ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ ও যিলহাজ্জ মাস। মদীনার সর্বশেষ এই ইহুদী গোত্রটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে আক্রমণকারী বাহিনীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ও তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে। বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখত্বাবের প্ররোচনায় তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। আহযাব যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় ফিরে আসেন যুলক্বা'দাহ মাসের শেষ সপ্তাহের বুধবারে। এসে যোহরের সময় যখন তিনি উম্মে সালামার গৃহে গোসল করছিলেন, তখন জিব্রীলের আগমন ঘটে এবং তাকে তখনই বনু কুরায়যার উপরে হামলা পরিচালনার আহবান জানিয়ে বলেন, আপনি দ্রুত আসুন! আমি আগে গিয়ে দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করে ওদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিই'। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাথে সাথে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, যেন সবাই বনু কুরায়যায় গিয়ে আছর পড়ে। এই সময় রাসূলের সাথে ৩০০০ সৈন্য ছিলেন। ২৫ দিন অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের মিত্র সা'দ বিন মু'আযের সিদ্ধান্ত মতে তাদের বয়স্ক পুরুষ বন্দী ছয় থেকে সাত শতের মত লোককে হত্যা করা হয়। বাকীদের বহিষ্কার করা হয়। এই অবরোধকালে মুসলিম পক্ষে একজন শহীদ ও একজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) মৃত্যু বরণ করেন। যিনি ইতিপূর্বে খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।

৩৩। সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক আনছারী : ৫ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু কুরায়যার শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পর খায়বারের আবু রাফে' দুর্গের অধিপতি অন্যতম শীর্ষ দুষ্টমতি ইহুদী নেতা এবং মদীনা থেকে

বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম সর্দার সালাম বিন আবুল হুক্বাইক্বকে হত্যার জন্য খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার লোকেরা রাসূলের নিকটে দাবী করে। সালামের উপনাম ছিল আবু রাফে‘। সে ছিল কা‘ব বিন আশরাফের ন্যায় প্রচন্ড ইসলাম ও রাসূল বিদ্বেষী ইহুদী নেতা। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বদা সে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করত। ওহোদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনায় বনু সালামা গোত্রের লোকেরা ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যায়নি। এ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত নাযিল হয়। খন্দকের যুদ্ধের দিনও এরা মুনাফিকদের প্ররোচনায় যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যেতে চেয়েছিল এবং রাসূলের নিকটে ওযর পেশ করেছিল (আহযাব ১২-১৩)। সেই বদনামী দূর করার জন্য এবং ইতিপূর্বে ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আউস গোত্রের লোকেরা মুহাম্মাদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে রাসূলের নির্দেশে কা‘ব বিন আশরাফকে হত্যা করে প্রশংসা কুড়িয়েছিল, অনুরূপভাবে একটি দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য তারা রাসূলের অনুমতি প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসূলের অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আতীকের নেতৃত্বে তাদের পাঁচ সদস্যের একটি দল খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং কৌশলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবু রাফে‘ সালাম বিন আবিল হুক্বাইক্বকে হত্যা করে ফিরে আসে।

৩৪। সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাস। মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নাজদের বনু বাকর বিন কিলাব গোত্রের প্রতি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আনছারীর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই দলকে ১০ই মুহাররম তারিখে মদীনা থেকে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে তারা পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসার পথে ইয়ামামার হানীফা গোত্রের সরদার ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী **(ثمامة بن أثال)** তাদের হাতে গ্রেফতার হয়। উক্ত ব্যক্তি ইয়ামামার নেতা মুসায়লামার নির্দেশ মতে ছদ্মবেশে মদীনায় যাচ্ছিল রাসূলকে গোপনে হত্যা করার জন্য। উল্লেখ্য যে, মুসায়লামা ১০ম হিজরী সনে নিজেই মিথ্যা নবুঅত দাবী করে এবং হযরত আবুবকরের খেলাফত কালে দ্বাদশ হিজরী রবীউল আউয়াল মাসে ইয়ামামার যুদ্ধে ওয়াহশীর হাতে নিহত হয়। ছুমামাকে এনে মসজিদে নববীর খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করেন **ما عندك يا ثمامة** ‘তোমার নিকটে কি আছে হে

ছুমামাহ! সে বলল, **عندي خير يا محمد** ‘আমার কাছে মঙ্গল আছে হে মুহাম্মাদ’! এভাবে তিনদিন একই প্রশ্নের একই জবাব দিলে রাসূল (ﷺ) তাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। মুক্তি পেয়ে সে গোসল করে এসে বায়‘আত করে ইসলাম কবুল করে। অতঃপর সে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ করে। সেখানে কুরায়েশ নেতারা তাকে বলে, **صبأة يا ثمامة** হে ছুমামা! তুমি কি বেদ্বীন হয়ে গেছ? জবাবে তিনি বলেন, না আমি মুসলমান হয়েছি। অতঃপর তিনি কুরায়েশ নেতাদের হুমকি দেন যে, ইয়ামামা থেকে তোমাদের জন্য গমের একটি দানাও আর আসবে না, যে পর্যন্ত না রাসূল নির্দেশ দেন’। ঐ সময় ইয়ামামা ছিল মক্কাবাসীদের জন্য শস্যভান্ডার স্বরূপ। হুমকি মতে শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূলের নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন রাসূলের নির্দেশে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়। মুহাররম মাসের একদিন বাকী থাকতে এই অভিযাত্রী দল মদীনায় ফিরে আসে। যা পরবর্তী সময়ের জন্য খুবই ফলদায়ক প্রমাণিত হয়।

৩৫। গাযওয়া বনু লাহিয়ান (غزوة بني لَحْيان) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা জুমাদাল ঊলা মাস। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে এই গোত্রের লোকেরা প্রতারণার মাধ্যমে ডেকে নিয়ে মক্কা সীমান্তে রাজী‘ নামক স্থানে ১০ জন নিরীহ ছাহাবীকে হত্যা করে। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত খোবায়েব (রাঃ)। তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং ২০০ সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে বের হন। রাজী‘ পৌঁছে ‘গারান’ **(بطن غران)** উপত্যকার যে স্থলে ৮ জন ছাহাবীকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদর উপর করুণাসিক্ত হয়ে পড়েন ও তাদের জন্য দো‘আ করেন **(ترحم عليهم ودعا لهم)**। বনু লাহিয়ান গোত্রের লোকেরা পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে দু’দিন অবস্থান করেন। পরে তিনি আসফান ও মক্কার দিকে ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন। কিন্তু কারু নাগাল না পেয়ে ১৪ দিন পরে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর থেকে তিনি বেদুঈন হামলা বন্ধের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট অভিযান সমূহ প্রেরণ করতে থাকেন।

৩৬। সারিইয়াহ উক্কাশা বিন মিহছান (سرية عكاشة بن محصن) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের। ৪০ জনের একটি সেনাদল নিয়ে বনু আসাদ গোত্রের গামার **(ماء غمر)** প্রস্রবণের দিকে উক্কাশার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। কেননা বনু আসাদ গোত্র

মদীনায় হামলা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিল। মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতিতে তারা পালিয়ে যায়। পরে গণীমত হিসাবে ২০০ উট নিয়ে বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

৩৭। সারিইয়াহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (سرية محمد بن مسلمة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের। ১০ সদস্যের একটি বিদ্বান দল মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর নেতৃত্বে বনু ছা'লাবাহ অঞ্চলের যুল-ক্বিছছা **(ذو القصة)** নামক স্থানে প্রেরিত হয়। মানছূরপুরী বলেন, এঁরা সেখানে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীমের জন্য গিয়েছিলেন। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুদের প্রায় একশত লোক এসে তাদেরকে হত্যা করে। দলনেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আহত অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হন।

৩৮। সারিইয়া আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (سرية أبي عبيدة بن الجراح) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের। পূর্বের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ৪০ জনের এই দল যুল-ক্বিছছায় প্রেরিত হয়। কিন্তু বনু ছা'লাবাহ গোত্রের সবাই পালিয়ে যায়। একজন গ্রেফতার হ'লে সে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে তাদের পরিত্যক্ত গবাদি-পশু নিয়ে তারা ফিরে আসেন।

৩৯। সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের মাস। যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে একটি সেনাদল মাররুয যাহরানের বনু সুলায়েম গোত্রের 'জুমূম' **(ماء جموم)** ঝর্ণার দিকে প্রেরিত হয়। বনু সুলায়েমের কয়েকজন লোক বন্দী হয়। হালীমা নাম্নী একজন বন্দী মহিলা সহ বাকী বন্দী ও গবাদিপশু নিয়ে যায়েদ মদীনা ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বন্দীদের ছেড়ে দেন ও মহিলাকে মুক্ত করে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন।

৪০। সারিইয়া যায়েদ ইবনু হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল ঊলা। ১৭০ জনের একটি দল নিয়ে তিনি শামের নিকটবর্তী ঈছ **(العيص)** অভিমুখে প্রেরিত হন। ঐপথে তখন রাসূলের জামাতা আবুল 'আছ বিন রবী' বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুছাই-এর নেতৃত্বে একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা

মক্কা অভিমুখে অতিক্রম করছিল। আবুল ‘আছ দ্রুত মদীনায় এসে নবী তনয়া যয়নবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাসূলকে কাফেলার সব মালামাল ফেরত দানের অনুরোধ করেন। সেমতে তাকে সব মাল ফেরৎ দেওয়া হয়। আবুল ‘আছ মক্কায় গিয়ে পাওনাদারদের মালামাল বুঝিয়ে দেন ও প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায় তিন বছরের কিছু পরে যয়নবকে পূর্বের বিবাহের উপরে তার স্বামীর নিকটে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, আবুল ‘আছ ছিলেন যয়নবের আপন খালাতো ভাই এবং খাদীজার জীবদ্দশায় তাদের বিবাহ হয়।

৪১। সারিইয়া যায়েদ ইবনু হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। ১৫ সদস্যের একটি বাহিনীসহ তিনি বনু ছা‘লাবা গোত্রের তরফ **(الطرف)** অথবা তুরুক্ব **(طرق)** নামক স্থানে প্রেরিত হন। কিন্তু শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। ৪ দিন অবস্থান শেষে যায়েদ মদীনায় ফিরে আসেন।

৪২। সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাস। ১২ জনের একটি দল ওয়াদিল ক্বোরা **(وادي القرى)** এলাকায় প্রেরিত হন শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে ৯ জনকে হত্যা করে। যায়েদ সহ তিনজন রক্ষা পান।

৪৩। গাযওয়া বনুল মুছত্বালিক্ব বা মুরাইসী (غزوة بني المصطلق أو المريسيع) : ৬ষ্ঠ হিজরীর ৩রা শা‘বান। মুরাইসী‘ নামক ঝর্ণাধারার নিকট উপনীত হওয়ার পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানগণ সহজ বিজয় অর্জন করেন। কাফের পক্ষের ১০ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়। মুসলিম পক্ষে একজন নিহত হন। জনৈক আনছার তাকে শত্রু ভেবে ভুলক্রমে হত্যা করেন। গোত্রনেতা হারেছ কন্যা জুওয়াইরিয়া **(جويرية)** -এর সঙ্গে রাসূলের বিবাহ হয়। ফলে শ্বশুর গোত্রের লোক হওয়ায় বিজিত দলের একশত পরিবারকে মুক্তি দিলে তারা সবাই ইসলাম কবুল করে। এই যুদ্ধে ওহোদ যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম মুনাফিকদের একটি দলকে রাসূলের সাথে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই যুদ্ধ হ’তে ফেরার সময় ইফকের ঘটনা ঘটে। এই সময় সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয় এবং পরে হযরত আয়েশার পবিত্রতা বর্ণনায় সূরা নূর ১১-২০ পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয়।

৪৪। সারিইয়া আব্দুর রহমান ইবনে ‘আওফ (سرية عبد الرحمن بن عوف القرشي) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা‘বান মাসে। দূমাতুল জান্দাল এলাকায় বনু কলব খৃষ্টান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং সহজ বিজয় অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন ও যুদ্ধে সর্বোত্তম পন্থা গ্রহণের উপদেশ দেন। তিনি এখানে তিনদিন অবস্থান করে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে খৃষ্টান গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়।

৪৫। সারিইয়া আলী ইবনে আবু ত্বালিব (سرية على بن أبي طالب) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শা‘বান মাসে। ২০০ জনের একটি সেনাদল নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) খায়বরের ফিদাক অঞ্চলে বনু সা‘দ বিন বকর গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বনু সা‘দ পালিয়ে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া ৫০০ উট ও ২০০০ ছাগল মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

৪৬। সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক (سرية أبي بكر الصديق) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে। ওয়াদিল ক্বোরা এলাকার বনু ফাযারাহ গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মে কুরফা (أم قرفة) ৩০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে প্রস্তুত করেছে রাসূলকে অপহরণ ও হত্যা করার জন্য। এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে হযরত আবু বকর অথবা হযরত যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সেখানে একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। উক্ত ৩০ জনের সবাইকে হত্যা করা হয় এবং দলনেত্রীর কন্যা অন্যতম সেরা আরব সুন্দরী মেয়েকে (من أحسن العرب) দাসী হিসাবে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে সেখান থেকে কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়।[মুসলিম ২/৮৯।]

৪৭। সারিইয়া কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী (سرية كرز بن جابر الفهري) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে উরাইনা গোত্রের প্রতি তিনি ২০ জন অশ্বারোহী সহ প্রেরিত হন। দলনেতা কুরয ছিলেন কুরায়েশ নেতা, যিনি ২য় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে সর্বপ্রথম মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে বহু গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যান এবং রাসূল (ﷺ) স্বয়ং যার পশ্চাদ্ধাবন করে বদরের উপকণ্ঠে সাফওয়ান পর্যন্ত পৌঁছে যান (দ্রঃ গাযওয়া সাফওয়ান ক্রমিক সংখ্যা-৬)। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন শহীদ হন। অত্র অভিযানের কারণ ছিল এই যে, ওক্ল ও

উরাইনা (عكل وعرينة) গোত্রের কিছু লোক ইসলাম কবুল করে মদীনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদেরকে কিছু দূরে উটের চারণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে তাদেরকে উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলা হয়। এতে তারা দ্রুত সুস্থতা লাভ করে। কিন্তু একদিন তারা রাসূলের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো সব নিজেদের এলাকায় খেদিয়ে নিয়ে যায় এবং পুনরায় কাফির হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়।

অভিযান প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দো'আ করেছিলেন যে, اللهم اعم عليهم الطريق واجعلها عليهم اضيق من مسك 'আল্লাহ তুমি ওদের রাস্তা অন্ধকার করে দাও এবং তা তাদের উপরে .... চাইতে সংকীর্ণতর করে দাও'। প্রেরিত সেনাদল তাদের গ্রেফতার করেন এবং হাত-পা কেটে ও চোখ অন্ধ করে 'হাররাহ' (حرّة) নামক স্থানে ছেড়ে দেন। সেখানেই তারা মরে পড়ে থাকে।[মুসলিম, আনাস হ'তে ২/৮৯ পৃঃ।] মানছূরপুরী এদের সংখ্যা ৮ জন বলেছেন।

৪৮। সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (سرية عمرو بن أمية الضمري) : ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে। সালামাহ বিন আবু সালামাহ সহ দুইজনের এই ক্ষুদ্র দলটি প্রেরিত হয় আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য। কেননা তিনি ইতিপূর্বে একজন বেদুঈনকে মদীনায় পাঠিয়েছিলেন রাসূলকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু কারু কোন অভিযানই সফল হয়নি।

৪৯। সারিইয়া আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (سرية أبي عبيدة بن الجراح) : ৬ষ্ঠ হিজরীতে যুলক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে। আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৩০০ অশ্বারোহীর এ দলটি প্রেরিত হয় একটি কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য। অভিযানে কোন ফল হয়নি। কিন্তু সেনাদল দারুণ অন্নকষ্টে পতিত হন। ফলে তাদের গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। সেকারণ এই অভিযান **جيش الخبط** বা 'ছাল-পাতার অভিযান' নামে অভিহিত হয়। এই সময় সমুদ্র হ'তে একটি বিশালাকারের মাছ কিনারে নিক্ষিপ্ত হয়। যাকে আম্বর (العنبر) বলা হয়। বাংলাতে যা 'তিমি মাছ' বলে পরিচিত। এই মাছ তারা ১৫দিন যাবৎ ভক্ষণ করেন। এই মাছ এত বড় ছিল যে, সেনাপতির হুকুমে তার একটি কাঁটার ঘেরের মধ্য দিয়ে দলের মধ্যকার সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি সবচেয়ে উঁচু উটটির পিঠে আরোহন করে

অনায়াসে চলে যায়। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে উক্ত মাছের কিছু অংশ মদীনায় আনা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'হাদিয়া' প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, **هو رزق أخرجه الله لكم** 'এটি রূযী, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্গত করেছিলেন'।[বুখারী ২/৬২৫ ও মুসলিম ২/১৪৫। মুবারকপুরী বলেন যে, চরিতকারগণ এটিকে ৮ম হিজরীর রজব মাসের ঘটনা বলে থাকেন। কিন্তু পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় দেখা যায় যে, এটি হুদায়বিয়ার পূর্বের ঘটনা। কেননা ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল ক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পরে কুরায়েশ কাফেলাকে হামলা করার জন্য আর কোন মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হয়নি'।]

৫০। গাযওয়া হুদায়বিয়া (غزوة حديبية) : ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাথী নিয়ে ওমরাহর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১লা যুলক্বা'দাহ সোমবার স্ত্রী উম্মে সালামাহ সহ মদীনা হ'তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত তাদের সাথে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু মক্কার অদূরবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে কুরায়েশ নেতাদের বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে তাদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং পরের বছর ওমরা করেন। এই সময় 'আসফান' **(عسفان)** নামক স্থানে সর্বপ্রথম ছালাতুল খাওফের হুকুম নাযিল হয় (নিসা ১০১-১০২)। কেননা খালেদ বিন ওয়ালীদ আছরের ছালাতের সময় ছালাতরত অবস্থায় মুসলমানদের উপরে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, খালিদ তখনও মুসলমান হননি। খালেদ ও আমর ইবনুল আছ ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন।

৫১। গাযওয়া যী ক্বারদ (غزوة ذي قرد أو الغابة) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে এটাই ছিল রাসূলের প্রথম যুদ্ধ, যা খায়বর যুদ্ধে গমনের মাত্র তিনদিন পূর্বে সংঘটিত হয়। বনু গাত্বফানের ফাযারা গোত্রের আব্দুর রহমান ফাযারীর নেতৃত্বে একটি ডাকাত দল মদীনায় এসে রাসূলের রাখালকে হত্যা করে চারণ ভূমি থেকে রাসূলের উট সমূহ লুট করে নিয়ে যায়। দক্ষ তীরন্দায সালামা বিন আকওয়া একাই পদব্রজে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যী ক্বারদ প্রস্রবণ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তাড়িয়ে নিয়ে যান। তারা সমস্ত উট ছাড়াও তাদের নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র

ফেলে পালিয়ে যায়। পিছে পিছে রাসূল (ﷺ) ৫০০ ছাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হন। ডাকাত দলের নেতা আব্দুর রহমানের নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে ছাহাবী আখরাম শহীদ হন। পরে আবু ক্বাতাদার বর্শার আঘাতে আব্দুর রহমান নিহত হয়। সালামা বিন আকওয়া-এর দুঃসাহস ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে গনীমতের দুই অংশ দান করেন এবং মদীনায় ফেরার সময় সম্মান স্বরূপ নিজের উটের পিঠে তাকে বসিয়ে নেন।

৫২। গাযওয়া খায়বর (غزوة خيبر) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির পর সকল ষড়যন্ত্রের মূল ঘাঁটি খায়বরের ইহুদীদের প্রতি এই অভিযান পরিচালিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়‘আতে রিযওয়ানে উপস্থিত ১৪০০ ছাহাবীকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। অন্যদের নেননি। এতে মুসলিম পক্ষে ১৮ জন শহীদ ও ৫০ জন আহত হন। ইহুদী পক্ষে ৯৩ জন নিহত হয়। ইহুদীদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাদের আবেদন মতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ দেবার শর্তে তাদেরকে সেখানে বসবাস করার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ হয়। যাতে মুসলমানদের অভাব দূর হয়ে যায়। এই সময়ে ফিদাকের ইহুদীদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুহাইছাহ বিন মাসঊদকে প্রেরণ করেন। খায়বর বিজয়ের পরে তারা নিজেরা রাসূলের নিকটে দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং খায়বরবাসীদের ন্যায় অর্ধেক ফসলে সন্ধিচুক্তি করে। বিনাযুদ্ধে ও স্রেফ রাসূলের দাওয়াতে বিজিত হওয়ায় ফিদাক ভূমি কেবল রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

৫৩। গাযওয়া ওয়াদিল ক্বোরা (غزوة وادي القرى) : ৭ম হিজরীর মুহাররম মাস। খায়বার যুদ্ধের পরে রাসূল (ﷺ) এখানকার ইহুদীদের প্রতি গমন করেন। দিনভর যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে রাসূলের একজন দাস এবং ইহুদী পক্ষে ১১ জন নিহত হয়। বিপুল গনীমত হস্তগত হয়। ইহুদীরা সন্ধি করে এবং চাষের জমিগুলি তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দেওয়ার শর্তে, যেভাবে খায়বারে করা হয়েছিল। ফেদাক ও তাইমার ইহুদীরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

৫৪। সারিইয়া আবান বিন সাঈদ (سرية أبان بن سعيد) : ৭ম হিজরীর ছফর মাসে মদীনার আশপাশের লুটেরা বেদুঈনদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবান বিন সাঈদের নেতৃত্বে নাজদের দিকে প্রেরিত হয় এবং যথাসময়ে তারা অভিযান সফল করে ফিরে আসে।[বুখারী, মানছূরপুরী এটা ধরেননি।]

৫৫। গাযওয়া যাতুর রিক্বা‘ (غزوة ذات الرقاع) : ৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। খন্দকের যুদ্ধে শত্রুদের তিনটি প্রধান পক্ষের দু’টি অর্থাৎ কুরায়েশ ও ইহুদী পক্ষকে দমন করার পর তৃতীয় শক্তি নাজদের বনু গাত্বফানের দিকে এই অভিযান প্রেরিত হয়, যারা প্রায়ই মদীনার উপকণ্ঠে ডাকাতি ও লুটতরাজ করত। এদের কোন স্থায়ী জনপদ বা দুর্গ ছিল না। এরা ছিল সুযোগসন্ধানী ডাকাত দল। তাই মক্কা ও খায়বরবাসীদের ন্যায় এদের দমন করা সহজ ছিল না। ফলে এদের বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সমূহ প্রতিহত করার জন্য অনুরূপ আকস্মিক হামলা সমূহ পরিচালনা করার প্রয়োজন ছিল। সেমতে খায়বর বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৪০০ অথবা ৭০০ সাথী নিয়ে এদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আনমার অথবা বনু গাত্বফানের ছা‘লাবা ও মুহারিব গোত্রের লোকেরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে মর্মে সংবাদ পেয়ে তিনি অগ্রসর হন এবং নাখল **(نخل)** নামক স্থানে তাদের মুখোমুখি হন। কিন্তু তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আবু মূসা আশ‘আরী বলেন, আমাদের ৬ জনের জন্য মাত্র একটি উট ছিল, যা আমরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলাম। এ কারণে আমাদের পা সমূহ আহত হয় ও আমার নখ ঝরে পড়ে। ফলে আমরা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পায়ে পট্টি বাঁধি। এ কারণ এ যুদ্ধের নাম হয় যাতুর রিক্বা‘ বা ছেঁড়া পট্টির যুদ্ধ।[বুখারী ২/৫৯২; মুসলিম ২/১১৮।]

সরাসরি যুদ্ধ না হ’লেও এই অভিযানে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। যেমন, (১) তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগে জনৈক মুশরিক বেদুঈন গাওরাছ ইবনুল হারেছ অথবা দা‘ছূর এসে রাসূলের তরবারি নিয়ে নেয় ও তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। কিন্তু রাসূল (ﷺ) যখন বলেন যে, আমাকে রক্ষা করবেন ‘আল্লাহ’ তখন তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায় এবং পরে সে মুসলমান হয়ে যায়। (২) রাসূল (ﷺ) সবাইকে নিয়ে ‘ছালাতুল খাওফ’ আদায় করেন (৩) যুদ্ধ হ’তে ফেরার পথে বন্দীনী এক মুশরিক মহিলার স্বামী বদলা হিসাবে মুসলিম বাহিনীর রাতের বেলায় বিশ্রামের

সুযোগে পাহারায় নিযুক্ত ছাহাবী আববাদ বিন বিশরের উপরে ছালাতরত অবস্থায় তিন তিনটি তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে মারাত্মক আহত করা সত্ত্বেও তিনি ছালাত ভঙ্গ করেননি। পরে অন্য পাহারা আম্মার বিন ইয়াসার যখন বলেন, আমাকে কেন জাগাননি? তখন তিনি বলেন, **إِنِّيْ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ فَكَرِهْتُ أَنْ اَقْطَعَهَا** 'আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম। যা থেকে বিরত হওয়াটা আমি অপসন্দ করেছিলাম'।
এই অভিযানের ফলে বনু গাত্বফানের লোকেরা আর মাথা উঁচু করেনি। তারা ক্রমে ক্রমে সবাই ইসলাম কবুল করে। তাদের অনেকে মক্কা বিজয়ের অভিযানে ও তার পরে হুনায়েন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে ছিল এবং হুনায়েনের গনীমতের অংশ লাভ করেছিল।

৫৬। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৭ম হিজরীর ছফর অথবা রবীউল আউয়াল মাস। ক্বাদীদ **(قديد)** অঞ্চলের বনু মলূহ **(بنو ملوح)** গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। কেননা তারা ইতিপূর্বে বাশীর বিন সুওয়াইদের **(بشير بن سويد)** সাথীদের হত্যা করেছিল। রাতেই হামলা করে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয় ও গবাদি-পশু নিয়ে সেনাদল ফিরে আসে। প্রতিপক্ষ বিরাট দল নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলেও হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

৫৭। সারিইয়া যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية زيد بن حارثة) : ৭ম হিজরী জুমাদাল আখেরাহ। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকটে রাসূলের প্রেরিত দূত ও পত্রবাহক দেহিইয়া কালবী সম্রাট প্রদত্ত উপঢৌকনাদিসহ ফেরার পথে হুসমা **(حسمى)** নামক স্থানে পৌঁছলে জুযাম **(جذام)** গোত্রের কিছু লোক তার উপরে হামলা করে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। মদীনায় ফিরে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশের আগে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্যের একটি দল হুসমার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা জুযাম গোত্রের কিছু লোককে হত্যা করেন এবং ১০০০ উট, ৫০০০ ছাগল ও শ'খানেক নারী ও শিশুকে পাকড়াও করে মদীনায় ফিরে আসেন।
উক্ত গোত্রের সাথে যেহেতু পূর্বেই সন্ধিচুক্তি ছিল এবং অন্যতম গোত্র নেতা যায়েদ সহ কয়েকজন আগেই ইসলাম কবুল করেছিল ও তারা ডাকাত দলের বিরুদ্ধে দেহিইয়াকে সাহায্য করেছিল, সেহেতু যায়েদ বিন রেফা'আহ জুযামী কালবিলম্ব না

করে মদীনায় আসেন ও রাসূলের নিকটে সবকিছু বর্ণনা করেন। তখন রাসূল (ﷺ) তাদেরকে গণীমতের সব মাল ফেরৎ দানের নির্দেশ দেন।

৫৮। সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (سرية عمر بن الخطاب) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। হাওয়াযেন গোত্রের বিরুদ্ধে তুরবাহ (**تربة**) নামক স্থানে ৩০ জনের এই অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ ভয়ে পালিয়ে যায়। ওমর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে ফিরে আসেন।

৫৯। সারিইয়া আবুবকর ছিদ্দীক (سرية أبي بكر الصديق) : বনু কেলাব গোত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়। এরা বনু গাত্বফানের মুহারিব ও আনমার গোত্র সমূহের সহযোগী ছিল এবং মুসলমানদের উপরে হামলার প্রস্ত্ততি নিচ্ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়। শত্রুদের কিছু নিহত ও কিছু আহত হয়।[মুবারকপুরী এটা ধরেননি। মানছুরপুরী সাল-তারিখ ও সেনা সংখ্যা বলেননি।]

৬০। সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ (سرية بشير بن سعد الأنصاري) : ৭ম হিজরীর শা'বান মাস। খায়বরের ফিদাক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে বাশীর বিন সা'দ আনছারীর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। তিনি সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে কিছু গবাদিপশু খেদিয়ে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু রাত্রি বেলায় শত্রুদল পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে। এমন সময় তাদের তীর ফুরিয়ে যাওয়ায় সবাই শহীদ হয়ে যান। দলনেতা বাশীর আহত অবস্থায় ফিদাকে নীত হন এবং এক ইহুদীর নিকটে অবস্থান করেন। পরে সুস্থ হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, ফিদাকের ইহুদীদের সাথে ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর যুদ্ধের সময় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৬১। সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৭ম হিজরীর রামাযান মাস। বনু আওয়াল (**بنو عوال**) অথবা জুহায়না (**جهينة**) গোত্রের বিরুদ্ধে মীফা'আহ[মানছূরপুরী মুনক্বা'আহ বলেছেন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন, ৩/১৯৭।] অথবা হারাক্বাত (**حرقات**) নামক স্থানে ১৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। যুদ্ধে তারা জয়ী হন এবং উট ও গবাদি-পশু নিয়ে ফিরে আসেন।

এই যুদ্ধে তরুণ যোদ্ধা উসামা বিন যায়েদ (ঐ সময় তাঁর বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে) শত্রু পক্ষের মিরদাস বিন নাহীক **(مرداس بن نهيك)** -কে হত্যা করেন কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করার পরেও (তিনি ভেবেছিলেন যে, লোকটি মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে)। একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুবই মর্মাহত হন এবং তাকে বলেন, **فَهَلاَّ شققتَ عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟** 'তাহ'লে কেন তুমি তার অন্তর চিরে দেখলে না, সে সত্যবাদী ছিল না মিথ্যাবাদী ছিল'?[মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/১৫২২ সনদ হাসান; মুসলিম হা/২৭৭ 'ঈমান' অধ্যায়, ৪৩ অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৬৮৭২-এর ব্যাখ্যা, ফাৎহুল বারী ১২/২০৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৫০, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়; মানছূরপুরী এটাকে পৃথক 'খারবাহ অভিযান' বলেছেন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২/১৯৭।]

৬২। সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (سرية عبد الله بن رواحة) : ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস।[মানছূরপুরী এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস লিখেছেন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২/১৯৫।] ৩০ জন অশ্বারোহীর এই দলটি খায়বরে প্রেরিত হয় আসীর অথবা বাশীর বিন রেযাম **(أسير أو بشير بن رزام)** -কে দমন করার জন্য। কেননা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনু গাত্বফানকে একত্রিত করছিল। আসীরকে এই বলে প্রলুব্ধ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাকে খায়বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন'। আসীর তার ত্রিশজন সঙ্গীসহ মুসলমানদের সাথে মদীনায় রওয়ানা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে কুধারণার বশবর্তী হয়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় এবং আসীর ও তার ৩০ সাথীর সকলে নিহত হয়।

৬৩। সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ (سرية بشير بن سعد الأنصاري) : ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস। বনু গাত্বফান অথবা ফাযারা গোত্রের ইয়ামন ও জাবার এলাকায় ৩০০ সৈন্যের এই দলটি প্রেরিত হয়। কেননা শত্রুরা তখন মদীনার সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের উপরে হামলার জন্য বিরাট একটি দল একত্রিত করেছিল। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের দল বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যায়। বহু গনীমত হস্তগত হয় ও দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হ'লে তারা মুসলমান হয়ে যায়।

৬৪। সারিয়াহ আবু হাদরাদ আসলামী (سرية أبي حدرد الأسلمي) : ৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে রাসূলের ওমরাহ পালনের পূর্বে। মাত্র দু'জন সঙ্গী সহ আবু হাদরাদকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রেরণ করেন জাশম বিন মু'আবিয়া **(جشم بن معاوية)** গোত্রের একটি দলের বিরুদ্ধে বনু গাত্বফানের গাবাহ **(الغابة)** নামক স্থানে। যেখানে তারা জমা হয়েছিল ক্বায়েস গোত্রের লোকরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল করার জন্য। আবু হাদরাদ (রাঃ) সেখানে গিয়ে এমন এক যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন যে, শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বহু উট ও গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৬৫। সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা (سرية ابن أبي العوجاء) : ৭ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু সুলায়েম **(بنو سليم)** গোত্রকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ৫০ জনের এই দলটিকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা অগ্রাহ্য করে বলে, **لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا** 'তুমি যেদিকে আমাদের আহবান করছ, আমাদের তার কোন প্রয়োজন নেই'। অতঃপর তারা মুসলিম দলটির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দলনেতা আহত হন। তবে শত্রু পক্ষের দু'জনকে তারা বন্দী করতে সক্ষম হন।[কিন্তু মানছূরপুরী বলেন যে, মুসলিম বাহিনীর ১ জন আহত ও ৪৯ জন শহীদ হন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২/১৯৮।]

৬৬। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৮ম হিজরীর ছফর মাস। ২০০ লোকের একটি সেনাদল নিয়ে তিনি ফেদাক অঞ্চলের বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন বশীর বিন সা'দের ৩০ জন সাথীর শাহাদাত স্থলে। যা ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুদের অনেকে নিহত হয় ও বহু গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৬৭। সারিইয়াহ যাতে আত্বলাহ (سرية ذات أطلح) : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মুসলমানদের উপরে হামলা করার জন্য বনু কুযা'আহ **(بنو قضاعة)** বিরাট একটি দলকে একত্রিত করছে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কা'ব বিন ওমায়ের আনছারীর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সেখানে প্রেরণ করেন। তারা যাতু

আত্বলাহ (ذات أطلح) নামক স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি হন। তাঁরা প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যাতে সকল ছাহাবীকে তীর দিয়ে ছিদ্র করে করে শহীদ করা হয় নিহতদের মধ্যে একজন মাত্র কোনভাবে বেঁচে যান।

৬৮। সারিইয়াহ যাতে ইরক্ব (سرية ذات عرق) : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু হাওয়াযেন গোত্র বারবার শত্রুদের সাহায্য করে যাচ্ছিল। ফলে তাদের দমনের জন্য শুজা‘ বিন ওয়াহাব আল-আসাদীর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল উক্ত গোত্রের যাতু ইরক্ব (ذات عرق) নামক স্থানে প্রেরিত হয়। যুদ্ধ হয়নি। তবে কিছু গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৬৯। সারিইয়া মুতা (سرية مؤتة) : ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাস। রোম সম্রাট ক্বায়ছারের পক্ষ হ’তে সিরিয়ার বালক্বায় (البلقاء) নিযুক্ত গবর্ণর শোরাহবীল বিন আমর আল-গাসসানীর নিকটে পত্র সহ প্রেরিত রাসূলের দূত হারেছ বিন উমায়ের আযদীকে হত্যা করা হয়। যা ছিল তৎকালীন সময়ের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। ফলে মুসলমানদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অতএব যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে শোরাহবীলের ছিল প্রায় ২ লাখ সৈন্যের এক বিশাল খৃষ্টান বাহিনী। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী ‘মুতা’ নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর সেনাপতি জাফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর শহীদ হ’লে সকলের ঐক্যমতে খালিদ বিন ওয়ালীদ সেনাপতি হন। তিনি সম্মুখের দলকে পিছনে, পিছনের দলকে সম্মুখে ডাইনের দলকে বামে এবং বামের দলকে ডাইনে নিয়ে এক অপূর্ব রণকৌশলের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে সসম্মানে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনেন। নতুন সেনাদল যুক্ত হয়েছে ভেবে এবং মুসলমানেরা তাদেরকে মরু প্রান্তরে নিক্ষেপ করবে সেই ভয়ে রোমানরা পিছু হটে যায়। মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালেদ বিন ওয়ালীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল, তাতে অনুমান করা চলে কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল।

তৎকালীন বিশ্বের এই সেরা পরাশক্তির সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর এই বীরত্বপূর্ণ মুকাবিলায় খৃষ্টান বিশ্ব যেমন ভয়ে চমকে যায়, আরব বিশ্ব তেমনি হতচকিত হয়ে পড়ে। মাথা উঁচু করার স্বপ্ন ভুলে গিয়ে চির বৈরী বনু গাত্বফান, বনু সুলায়েম, বনু আশজা‘, বনু যুবিয়ান, বনু ফাযারাহ প্রভৃতি গোত্রগুলো ইসলাম কবুল করল। অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আরব অঞ্চলে ও দূরবর্তী অঞ্চল সমূহে মুসলিম বিজয়ের সূচনা হ’ল।

৭০। সারিইয়া যাতুস সালাসেল (سرية ذات السلاسل) : ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রথমে ৩০০ এবং পরে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০০ মোট ৫০০ সৈন্যের এই দলটি সিরিয়া সীমান্তে বনু কুযা‘আহ **(بنو قضاعة)** গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এরা রোমানদের সঙ্গে মিলে মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী উক্ত গোত্রের ‘সালসাল’ **(السلسل)** নামক প্রস্রবণের নিকটে অবতরণ করে বিধায় অভিযানটির নাম হয় ‘যাতুস সালাসেল’। শত্রুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। শেষোক্ত সাহায্যকারী বাহিনীতে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আছকে সেনাপতি করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর দাদী অর্থাৎ পিতার মা ছিলেন অত্র এলাকার ‘বালী’ **(بلى)** গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে তারা রোমকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।

৭১। সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ (سرية أبي قتادة) : ৮ম হিজরীর শা‘বান মাস। নাজদের বনু গাত্বফানের শাখা ‘মুহারিব’ **(محارب)** গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলার জন্য তাদের এলাকায় খাযেরাহ **(خضرة)** নামক স্থানে সেনা প্রস্তুত করছে জানতে পেরে ১৫ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। তারা তাদের অনেককে হত্যা করেন ও বাকীরা পালিয়ে যায়। অনেক গনীমত হস্তগত হয়। তারা এ সফরে ১৫ দিন মদীনার বাইরে থাকেন।

৭২। গাযওয়া ফাৎহে মাক্কা (غزوة فتح مكة) বা মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ : ৮ম হিজরীর ১০ই রামাযান মঙ্গলবার ১০,০০০ ছাহাবী নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মদীনা হ’তে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার আকস্মিকভাবে মক্কায় উপস্থিত হন ও

একপ্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। মক্কা বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করার অপরাধেই কুরায়েশদের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

৭৩। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ (سرية خالد بن وليد) : ৮ম হিজরীর ২৫ রামাযান। কুরায়েশ ও বনু কেনানার সবচেয়ে বড় দেবতা উযযা **(العزى)** দেবীমূর্তি ভাঙ্গার জন্য একটি ছোট্ট সেনাদল সহ তিনি 'নাখলা' উপত্যকায় প্রেরিত হন। মূর্তি ভেঙ্গে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে পুনরায় পাঠান। সেবারে একজন বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ নগ্ন নারীকে বেরিয়ে আসতে দেখে খালেদ তাকে এক কোপে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন। ফিরে এসে এ ঘটনা বললে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **نعم تلك العزي وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدًا** 'হাঁ এটাই উযযা। তোমাদের দেশে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে সে এখন চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেল'।[নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; তাবাক্বাত ইবনু সা'দ ২/১৪৫-৪৬।] 'মূর্তিপূজারীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নারীদের আহবান করে' (নিসা ১১৭)-এর ব্যাখ্যায় ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, **مع كل صنم جنية** 'হাঁ, প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে মাদী জিন থাকে'।[আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান।] এরা মানুষকে অলক্ষ্যে থেকে প্রলুব্ধ করে এবং দলে দলে লোকেরা বিভিন্ন মূর্তি, প্রতিকৃতি, বেদী, মিনার ও কবরে গিয়ে অযথা শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মিথ্যা আশায় প্রার্থনা করে। যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হ'তে কোনরূপ দলীল অবতীর্ণ হয়নি।

৭৪। সারিইয়াহ 'আমর ইবনুল 'আছ (سرية عمرو بن العاص) : ৮ম হিজরীর রামাযান মাস। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রেহাত **(رهاط)** নামক স্থানে রক্ষিত হোযায়েল গোত্রের বড় দেবমূর্তি সুওয়া' **(سواع)** ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে একদল সঙ্গীসহ প্রেরণ করা হয়। প্রহরী বলল, তুমি এ কাজে সক্ষম হবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তুমি বাধাপ্রাপ্ত হবে'। তিনি বললেন, তোমরা এখনো বাতিলের উপরে আছ? এ মূর্তি কি শুনতে পায় না দেখতে পায়? বলেই তিনি ওটাকে গুঁড়িয়ে

দিলেন’। প্রহরীকে বললেন, এবার তোমার মত কি? সে বলল, **أسلمت لله** ‘আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম কবুল করলাম’।

৭৫। সারিইয়া সা‘দ বিন যায়েদ আশহালী (سرية سعد بن زيد الأشهلى) : ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে। ২০ জন অশ্বারোহী দল সহ সা‘দ বিন যায়েদ (রাঃ)-কে অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবী মূর্তি মানাত **(منـاة)** -কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়, যা ক্বাদীদের **(قديد)** মোশাল্লাল **(مشلل)** নামক জায়গায় স্থাপিত ছিল। এই মূর্তিকে বিশেষ করে আউস, খাযরাজ ও গাসসান গোত্রের লোকেরা পূজা করত। সা‘দ মূর্তির দিকে অগ্রসর হ’তেই একটি কৃষ্ণাঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট উলঙ্গ নারীকে স্বীয় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে আসতে দেখেন। এ সময় সে কেবল হায় হায় করছিল **(تدعو بالويل)**। সা‘দ তাকে এক আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর মূর্তি ও ভান্ডারগৃহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন।

৭৬। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ (سرية خالد بن وليد) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। মুহাজেরীন, আনছার ও বনু সুলায়েম গোত্রের সমন্বয়ে ৩৫০ জনের একটি দলকে বনু জুযাইমা **(بنو جُذَيْمَة)** গোত্রের লোকদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য পাঠানো হয়, যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু স্থানীয়রা স্পষ্টভাবে **أسلمنا** ‘আমরা ইসলাম কবুল করলাম’ না বলে **صبأنا** ‘আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি’ বলে। এতে সন্দেহে পতিত হয়ে খালেদ তাদের হত্যা করতে থাকেন ও বন্দী করতে থাকেন এবং পরে প্রত্যেকের নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সবাইকে নির্দেশ দেন। কিন্তু বনু সোলায়েম ব্যতীত মুহাজেরীন ও আনছার ছাহাবীগণ কেউ এ নির্দেশ মানেননি। এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ও তার সাথীগণ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সব ঘটনা বললে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু’বার বলেন, **اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ** ‘হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে, আমি তা থেকে তোমার নিকটে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি’।[বুখারী হা/৪৩৩৯; মিশকাত হা/৩৯৭৬ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।] উক্ত ঘটনায় খালেদ (রাঃ)-এর সাথে মুহাজির ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন ‘আওফের কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। একথা শুনে খালেদকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, **مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أُحُدٌ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركتَ غدوة رجل من أصحابي ولا**

روحته- ‘থেমে যাও খালেদ! আমার ছাহাবীগণ থেকে বিরত হও। আল্লাহর কসম! যদি ওহোদ পাহাড় সোনা হয়ে যায়। আর তা সবটাই তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তথাপি আমার একজন ছাহাবীর একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যার সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না’।[সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪৩১; ছাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদায় বর্ণিত উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।]

পরে আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিহত ব্যক্তিদের রক্তমূল্য এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দান করেন। মানছূরপুরী বলেন, এ ঘটনায় বনু জুযাইমার ৯৫ ব্যক্তি নিহত হয়। তবে এই সংখ্যা সঠিক নাও হ’তে পারে। উল্লেখ্য যে, খালেদ বিন ওয়ালীদ ও আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এবং বনু সুলায়েম মুতা যুদ্ধের পর ৮ম হিজরীর শেষার্ধ্বে ইসলাম কবুল করেন। সে হিসাবে এঁরা সবাই ছিলেন অপেক্ষাকৃত নতুন মুসলমান।

৭৭। গাযওয়া হোনায়েন (غزوة حنين) বা হুনায়েন যুদ্ধ : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হাওয়াযেন ও ছাক্বীফ গোত্রের আত্মগর্বী নেতারা মক্কা হ’তে আরাফাতের দিকে ২৬ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে হুনায়েন উপত্যকায় মালেক বিন আওফের নেতৃত্বে ৪০০০ দুঃসাহসী সেনার সমাবেশ ঘটায়। ফলে মক্কা বিজয়ের ১৯তম দিনে ৬ই শাওয়াল শনিবার আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মক্কার ২০০০ নও মুসলিম সহ মোট ১২,০০০ সাথী নিয়ে হুনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১০ই শাওয়াল বুধবার রাতে গিয়ে উপস্থিত হন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষে ৭১ জন নিহত হয় ও মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ হন। যুদ্ধে বিশাল পরিমাণের গনীমত হস্তগত হয়।

৭৮। গাযওয়া ত্বায়েফ (غزوة طائف) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হুনায়েন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নেতা মালেক বিন আওফ সহ পরাজিত ছাক্বীফ গোত্রের লোকেরা পালিয়ে গিয়ে ত্বায়েফের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথমে খালিদের নেতৃত্বে ১০০০-এর একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে গমন করেন। তারা তায়েফের দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধ কতদিন স্থায়ী ছিল এ বিষয়ে ১৫ দিন থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত মতামত রয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১২ জনের অধিক শহীদ হন ও অনেকে আহত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ফিরে আসেন। এ সময় ছাহাবীগণ তাঁকে ছাক্বীফ গোত্রের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করার আবেদন জানালে তিনি উত্তম দো‘আ করে বলেন, **اللهم اهد ثقيفا وآت بهم** ‘হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের

হেদায়াত কর এবং তাদেরকে নিয়ে এসো'।[সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪৮৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯৮৬।] আল্লাহ সেটাই কবুল করলেন এবং কিছুদিন পর তারা নিজেরা এসে ইসলাম কবুল করল।

৭৯। সারিইয়া উয়াইনা বিন হিছন ফাযারী (سرية عيينة بن حصن الفزاري) : ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস। বনু তামীম গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের জিযিয়া প্রদান না করার জন্য উত্তেজিত করছিল। সেকারণ তাদের বিরুদ্ধে 'ছাহরা' **(الصحراء)** এলাকায় ৫০ জন অশ্বারোহীর একটি দল প্রেরিত হয়। বনু তামীম পালিয়ে যায়। তাদের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে ৬২ জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। পর দিন তাদের ১০ জন নেতা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করে এবং সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়।[চরিতকারগণ এই ঘটনাকে ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস বললেও মুবারকপুরী এতে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি পৃথক কোন সাল বা তারিখ উল্লেখ করেননি।]

৮০। সারিইয়া কুত্বাহ বিন 'আমের (سرية قطبة بن عامر) : ৯ম হিজরীর ছফর মাস। তুরবার **(تربة)** নিকটবর্তী তাবালা **(تبالة)** অঞ্চলে খাছ'আম **(خثعم)** গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে ২০ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। যুদ্ধে তাদের অনেকে হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনী উট, বকরী, নারী সহ অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে আসে। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ছেড়ে দেন।

৮১। সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী (سرية ضحاك بن سفيان الكلابي) : ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য এই দলটিকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বনু কেলাব তাতে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের একজন নিহত হয়।

৮২। সারিইয়া আলী ইবনে আবী ত্বালেব (سرية على بن أبي طالب) : ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বিখ্যাত খৃষ্টান গোত্র ত্বাঈ **(الطيئ)** -এর 'ফুলস' **(الفلس)** মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ১৫০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। মূর্তি ভাঙ্গার পর দানবীর হাতেম তাঈ-এর পরিবার সহ অনেকে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেন। হাতেম তাঈ-এর বৃদ্ধা কন্যা সাফানাহ **(سفانة)** মুক্তি পেয়ে পলাতক ভাই খ্যাতনামা বিদ্বান ও গোত্রনেতা ‘আদী ইবনে হাতেমকে পাবার জন্য সিরিয়ায় যান। পরে ‘আদী মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে যান।

৮৩। সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজযিয আল-মুদলেজী

(سرية علقمة بن مجزز المدلجي) : ৯ম হিজরীর রবীউল আখের। হাবশার কিছু নৌদস্যু জেদ্দা তীরবর্তী এলাকায় সমবেত হয়ে মক্কায় হামলা করার ষড়যন্ত্র করছে জানতে পেরে ৩০০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। আলক্বামা একদল সাথী নিয়ে সাগরে নেমে যান ও একটি দ্বীপে পৌঁছে যান। এ খবর পেয়ে দস্যুদল দ্রুত পালিয়ে যায়।[ফাৎহুল বারী ৮/৫৯ পৃঃ।] মানছূরপুরী দলনেতার নাম আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ আল-ক্বারশী আস-সাহমী **(عبد الله بن حذافة القرشي السهمي)** লিখেছেন।[রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২০২।]

৮৪। গাযওয়া তাবূক (غزوة تبوك) : ৯ম হিজরীর রজব মাস। এটাই ছিল রাসূলের জীবনের শেষ যুদ্ধ এবং যা রোমকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ সময় মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ এবং রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০-এর বেশী। গত বছরে মুতার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সরাসরি মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নেয়। তাতে মদীনার সর্বত্র রোমক ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (ﷺ) তাদের প্রতিরোধে রোমান সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলে তারা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। রামাযান মাসে মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

এই অভিযান কালে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। ৫০ দিনের এই সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে এবং ২০ দিন তাবূকে অবস্থানে ব্যয়িত হয়। এই যুদ্ধকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ছিল নিম্নরূপ- (১) যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় কঠিন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। এমনকি পর্যাপ্ত ভরণ-পোষণ দাবী করায় ও তাতে ব্যর্থ হওয়ায় রাসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে মাসব্যাপী সঙ্গত্যাগের অর্থাৎ ‘ঈলা’ করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হন (২) অন্য দিকে মুনাফিকরা মুসলিম বাহিনীতে ফাটল সৃষ্টির জন্য ক্বোবায় ‘মসজিদে যেরার’ তৈরী করে এবং রাসূলকে সেখানে ছালাত আদায়ের আমন্ত্রণ জানায়। তাবূক থেকে ফিরে এসে তিনি সেখানে যাবেন বলে কথা দেন। (৩)

যুদ্ধের ফান্ডে দানের প্রতিযোগিতা হয়। আবুবকর (রাঃ) তাঁর সকল সম্পদ মিলিয়ে ৪০০০ দিরহাম, ওমর (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ, মহিলাগণ তাদের গহনা-পত্র এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ তাদের সাধ্যমত দান করেন। এদিন সবার উপরে দান ছিল হযরত ওছমানের। রাসূলের কোলে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও তিনি ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দান করে রাসূলের বিশেষ দো'আ লাভ করেন। কিন্তু মুনাফিকরা দান করা থেকে বিরত থাকে। (৪) দুর্বল অজুহাত দেখিয়ে তিন জন নিষ্ঠাবান মুসলমান এদিন যুদ্ধে যাননি (৫) গড়ে ১৮ জনের একটি দলের জন্য বাহন ছিল মাত্র ১টি উট (৬) গাছের ছাল-পাতা খেয়ে ও যবেহকৃত উটের নাড়ী-ভুঁড়ির পানি পান করে ছাহাবীগণ অতিকষ্টে বেঁচে থাকেন। এজন্য এ যুদ্ধকে 'জায়শুল 'উসরাহ' **(جيش العسرة)** বা 'কষ্টের যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। (৭) ছামূদ জাতির গযবের স্থান 'হিজর' অতিক্রম করার সময় সেখানকার পানি পান না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় (৮) মু'জেযার মাধ্যমে একটি শুষ্ক ঝর্ণা হ'তে অবিরাম পানি নির্গত হয় (৯) ছালাত তাক্বদীম ও তাখীরের মাধ্যমে জমা ও ক্বছর করা হয় (১০) প্রবল ঘুর্ণিঝড়ের ফলে শত্রু পক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার হয় (১১) মদীনায় ফেরার সময় একটি সংকীর্ণ গিরিপথে ১২ জন মুখোশ ধারী মুনাফিক রাসূলকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায় (১২) তাবূক থেকে ফেরার দিন মদীনায় কিশোর-কিশোরীরা বিজয়ী রাসূলকে জানায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় **طلع البدر علينا...** বলে।

৮৫। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ (سرية خالد بن وليد) : ৯ম হিজরীর রজব মাস। বিনা যুদ্ধে বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবূকে অবস্থানকালেই পার্শ্ববর্তী দূমাতুল জান্দালের **(دومة الجندل)** খৃষ্টান নেতা উকাইদারের **(أكيدر)** বিরুদ্ধে ৪২০ জনের সেনাদল সহ খালেদকে প্রেরণ করেন। খালেদ তাকে বনদী করে রাসূলের দরবারে আনেন এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৮৬। সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ বিন হারেছাহ

(سرية أسامة بن زيد بن الحارثة) : ১১ হিজরীর ছফর মাস। রোম সম্রাটের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এবং মো'আন **(معان)** ও পার্শ্ববর্তী আরব অঞ্চলের রোমক গবর্ণর ফারওয়াহ বিন 'আমর আল-জোযামীকে ইসলাম কবুলের অপরাধে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এ অভিযান প্রেরিত হয়। সিরিয়ার বালক্বা' ও ফিলিস্তীন

অঞ্চল অশ্বারোহীদের দ্বারা পদদলিত করে রোমকদের ভীত করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। অভিযান প্রেরণকালে উসামার হাতে পতাকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **سر إلى موضع قتل أبيك فأوطنهم الخيل** ‘যাও তোমার পিতার নিহত হওয়ার স্থানে এবং সেখানকার লোকদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করো’। বড় বড় ছাহাবী উসামাকে সেনাপতি হিসাবে মেনে নিতে না পারলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলেন, তোমরা তার পিতার ব্যাপারেও এরূপ বলেছিলে। আল্লাহর কসম! সে যোগ্য ছিল। তার পুত্রও যোগ্য’।

কিন্তু মদীনা হ’তে তিন মাইল দূরে ‘জুরফ’ নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলের শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর শুনে বাহিনী সেখানেই যাত্রা বিরতি করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরে আবুবকরের খেলাফতকালে উক্ত বাহিনী পুনরায় যাত্রা করে এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য যে, মানছূরপুরী ৮২টি অভিযানের তালিকা দিয়েছেন ও মুবারকপুরীর তালিকা মিলিয়ে মোট ৮৬টি। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

উভয় পক্ষে শহীদ ও নিহতদের সংখ্যা :

মাদানী জীবনে ৮ বছরে সংঘটিত ৮৬টি গাযওয়া ও সারিইয়ার মধ্যে ২৯টি গাযওয়া ও ৫৭টি সারিইয়াতে উভয় পক্ষে নিহত ও শহীদগণের সঠিক তালিকা নির্ণয় করা মুশকিল। মানছূরপুরী যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, মুসলিম পক্ষে শহীদ হয়েছেন ২৫৯ জন এবং কাফের পক্ষে নিহত হয়েছেন ৭৫৯ জন। উভয়পক্ষে সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ১০১৮ জন।[রহমাতুল লিল আলামীন ২/২১৩ পৃঃ] কিন্তু মানছূরপুরী ও মুবারকপুরী উভয়ের দেওয়া যুদ্ধের বর্ণনা সমূহ হিসাব করে দেখা গেছে যে, মুসলিম পক্ষে ৩৩৯ জন এবং কাফির পক্ষে ১০৯১ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মানছূরপুরী সারিইয়া ইবনু আবিল আওজা-তে (ক্রমিক ৬৫) মুসলিম পক্ষে ৪৯ জন শহীদ বলেছেন, যেটা ৩৩৯ জনের হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু মুবারকপুরী উক্ত বিষয়ে কিছু বলেননি। অনুরূপভাবে গাযওয়া বনু কুরায়যাতে ইহুদীপক্ষে নিহতের সংখ্যা মানছূরপুরী ৪০০ বলেছেন। কিন্তু মুবারকপুরী ৬০০ থেকে ৭০০-এর মধ্যে বলেছেন। মানছূরপুরী ৪০০ ধরে হিসাব করেছেন। কিন্তু আমরা ৬০০ ধরে হিসাব করেছি। ফলে কাফের পক্ষে আমাদের হিসাব তাঁর চাইতে বেশী হয়েছে। এর পরেও ৭টি সারিইয়ায় প্রতিপক্ষের নিহতের সংখ্যা উল্লেখ না করে বলা হয়েছে ‘কিছু

লোক'। অতএব কাফের পক্ষে নিহতের সংখ্যা আরও কিছু বাড়তে পারে। উল্লেখ্য যে, সবচেয়ে বড় ৯টি যুদ্ধে অর্থাৎ বদর (ক্রমিক- ৯) ওহোদ (২০), খন্দক (৩১), খায়বর (৫২), মুতা (৬৯), মক্কা বিজয় (৭২), হোনায়েন (৭৭), ত্বায়েফ (৭৮) ও তাবূক (৮৪) যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যথাক্রমে ১৪, ৭০, ৬, ১৮, ১২, ২, ৬, ১২, ০০=১৪০ জন এবং কাফের পক্ষে ৭০, ৩৭, ১০, ৯৩, ০০, ১২, ৭১, ০০, ০০=২৯৩ জন সহ সর্বমোট ৪০৩ জন নিহত হয়েছে। তাবূক যুদ্ধে কোন পক্ষে হতাহত হয়নি। আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেভাবে দেশে দেশে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হয়, তার তুলনায় এগুলি তৃণসম বলা চলে।

অভিযান সমূহ পর্যালোচনা:

অভিযানগুলির মধ্যে ১ হ'তে ৭২-এর মধ্যে মোট ২১টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে কুরায়েশদের বিরুদ্ধে। ১১ হ'তে ৫৩-এর মধ্যে মোট ৮টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে ইহুদীদের বিরুদ্ধে। ৪৪ হ'তে ৮৬-এর মধ্যে ৬টি অভিযান খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং ১০ হ'তে ৮৩-এর মধ্যে মোট ৫১টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে নাজদ ও অন্যান্য এলাকার বেদুঈন গোত্র ও সন্ত্রাসী ডাকাত দলের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ২৪, ২৫ ও ৩৭ নং সারিইয়াহ তিনটি ছিল স্রেফ তাবলীগী কাফেলা এবং প্রতারণামূলকভাবে যাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়। বদর সহ প্রথম দিকের ৯টি অভিযান ছিল কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করে তাদের আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ভন্ডুল করার জন্য।

শুরুতে কুরায়েশদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের ভাষায় ছাবেঈ **(صابئي)** বা বিধর্মী মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথী মুষ্টিমেয় মুহাজিরদের নির্মূল করা এবং সেখানে আক্রোশটা ছিল প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস গত। কিন্তু পরে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মদীনা হয়ে সিরিয়ায় তাদের ব্যবসায়িক পথ কণ্টকমুক্ত করা। সেই সাথে ছিল তাদের বড়ত্বের অহংকার। কেননা মুহাম্মাদ তাদের বহিষ্কৃত সন্তান হয়ে তাদের চাইতে বড় হবে ও তাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে, এটা ছিল তাদের নিকটে নিতান্তই অসহ্য। তাদের এই ক্ষুব্ধ ও বিদ্বেষী মানসিকতাকেই কাজে লাগায় ধূর্ত ইহুদী নেতারা ও অন্যান্যরা। ফলে মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার মুসলিম অভিযানগুলির অধিকাংশ ছিল প্রতিরোধ মূলক।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযানগুলি হয় তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণে এবং অবিরত ভাবে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে। খৃষ্টানদের কোন তৎপরতা মদীনায় ছিল না। সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দালে প্রথম যে অভিযানটি (ক্রমিক-৪৪) তাদের দিকে প্রেরিত হয়, সেটি ছিল মূলতঃ তাবলীগী মিশন এবং তাতে তাদের গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়। পরে যে মুতার যুদ্ধ (ক্রমিক-৬৯) হয়, সেটি ছিল সিরিয়া অঞ্চলে রোমক গবর্ণর শোরাহবীলের মুসলিম দূত হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে। তাবূক যুদ্ধ ছিল আগ্রাসী রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে এবং তার প্রেরিত বিশাল বাহিনীর মদীনা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য। অবশেষে রোমকরা ভয়ে পিছু হটে গেলে কোন যুদ্ধ হয়নি। উল্লেখ্য যে, ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধে মুনাফেকী করার কারণে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদেরকে আর কোন যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেননি। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও অন্যান্যদের প্রকাশ্যে তওবা ও বারবার অনুরোধে তিনি তাদেরকে ৫ম হিজরীতে মুছত্বালিক যুদ্ধে (ক্রমিক-৪৩) যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু তারা যথারীতি মুনাফেকী করে। পরে তাদেরকে আর কোথাও অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাবূক অভিযানে (ক্রমিক-৮৪) তাদের ১২ জন এজেন্ট গোপনে ঢুকে পড়ে ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা চলে যে, ইসলামের দাওয়াত মক্কায় ছিল কেবল প্রচারমূলক। কিন্তু মদীনায় ছিল প্রচার ও প্রতিরোধ উভয় প্রকারের। যুগে যুগে ইসলামী দাওয়াতে উভয় নীতিই প্রযোজ্য হয়েছে। এখানে হারাম মাসে যুদ্ধ করার অনুমতিও পাওয়া গেছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যার সূত্রপাত ঘটে নাখলা যুদ্ধে (ক্রমিক-৮) । এ প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারাহ ২১৭নং আয়াতটি নাযিল হয়।

আল্লাহ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ * وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

লোকেরা তোমার কাছে পবিত্র মাসে (মুহাররম, রজব, যুলকাজ্ঞদা ও যুলহিজ্জা) যুদ্ধ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাও, এসময়ে যুদ্ধ করা একটি গুরুতর অন্যায়। তবে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেওয়া, তাঁর সাথে কুফরি করা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া ও তার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর কাছে আরো গুরুতর অন্যায়। আর ফেতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর।

তারা (কাফেররা) তোমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে পারলে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মুত্যুবরণ করবে তাদের কাজসমূহ দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাক্বারাহ-২১৭)

জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

জিহাদ ইসলামে একটি বহুমাত্রিক ও গভীর অর্থবোধক ধারণা, যা কেবল যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি আত্মসংযম, নৈতিকতা, সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার মতো বিস্তৃত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। কোরআন ও হাদিসে জিহাদের গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসলামী ইতিহাসে এটি মুসলিম সমাজের স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে! (সূরা আস-সফ ৬১:১১)।

আবার বলা হয়েছে:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমাদের জন্য যুদ্ধ (জিহাদ) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়। তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিস অপছন্দ করো, অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভাল; আবার এমনও হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিস পছন্দ করো, অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন (প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ), তোমরা জান না। (সূরা আল-বাকারা-২:২১৬) ।

এসব আয়াত স্পষ্ট করে যে জিহাদ মুসলিম জীবনে একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। আরও আয়াতে বলা হয়েছে:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

যেসব ঈমানদার অক্ষম নয় অথচ (জিহাদে না গিয়ে ঘরে) বসে থাকে তারা এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদকারীরা সমান হতে পারে না। নিজেদের জানমাল দিয়ে জেহাদকারীদেরকে আল্লাহ (ঘরে) বসে থাকা লোকদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেককে আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর

আল্লাহ জেহাদকারীদেরকে বড় পুরষ্কার দিয়ে (ঘরে) বসে থাকা লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, (সূরা আন-নিসা ৪:৯৫) ।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, মর্যাদায় তারাই আল্লাহর কাছে বড়। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আত-তাওবা-২০)।

এভাবে কোরআন জিহাদকে ঈমানের সঙ্গে যুক্ত করে মুসলিম জীবনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিসে জিহাদের মর্যাদা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো নিজের নফস (প্রবৃত্তি) ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা" [মুসনাদে আহমাদ, তিবরানি]

তিনি আরও বলেছেন:

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

ইসহাক ইবন মানসূর (রহঃ) ... তারিক ইবন শিহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন তিনি তাঁর পদদ্বয় ঘোড়র পাদানীতে রেখেছিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। (ইবন মাজাহ ৪০১১, সহীহাহ ৪৯১, মিশকাত ৩৭০৫)

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এসেছে,

و عن ابي ذر قال : قلت : يا رسول الله اي العمل افضل ؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيله متفق عليه

আবূ যার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী?' তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ২৬০)

এসব হাদিস থেকে বোঝা যায়, জিহাদ কেবল অস্ত্র হাতে যুদ্ধ নয়, বরং সত্য প্রতিষ্ঠা, নৈতিকতা রক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।
ইসলামী ইতিহাসে জিহাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মক্কা যুগে মুসলিমরা ধৈর্য ও দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ করেছেন। তারা নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু প্রতিশোধ নেননি। মদীনা যুগে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহর অনুমতিতে মুসলিমরা যুদ্ধ করেছেন, যেমন বদর, উহুদ ও হুনাইনের মতো যুদ্ধগুলোতে। এসব যুদ্ধ মুসলিম সমাজকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেছে এবং স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে। বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা সংখ্যায় কম হলেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করেন। উহুদের যুদ্ধে তারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তাদেরকে আরও দৃঢ় করে তোলে। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমরা আবারও প্রমাণ করেন যে জিহাদ শুধু অস্ত্রের শক্তি নয়, বরং ঈমানের দৃঢ়তা। ইসলামী ইতিহাসে জিহাদ মুসলিমদের আত্মমর্যাদা রক্ষা করেছে এবং তাদেরকে একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছে।
ব্যক্তিগত জীবনে জিহাদ মানে আত্মসংযম ও নৈতিকতা রক্ষা। নিজের প্রবৃত্তি ও পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই বড় জিহাদ। নামাজ, রোজা, দান-সদকা ও সৎকর্মের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। এভাবে একজন মুসলিম তার ব্যক্তিগত জীবনে জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। সমাজে জিহাদ মানে অন্যায়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। সত্য প্রচার, জ্ঞান বিস্তার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, দুর্বলদের অধিকার রক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধ বজায় রাখা জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রেও জিহাদ অপরিহার্য। ইসলামী শরীয়তে সশস্ত্র জিহাদ কেবল রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বৈধ। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসামরিকদের ক্ষতি করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এভাবে জিহাদ রাষ্ট্রকে

রক্ষা করে, কিন্তু মানবিকতা ও ন্যায়বিচারকে অক্ষুণ্ণ রাখে। আধুনিক যুগে জিহাদ মানে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম—দুর্নীতি, অন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, কারণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমাজকে উন্নত করে। নৈতিক জিহাদ মানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সততা, ন্যায় ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করা। আজকের বিশ্বে জিহাদ মানে শান্তি, ন্যায় ও মানবিকতার জন্য সংগ্রাম।

সবশেষে বলা যায়, জিহাদ ইসলামে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। কুরআন ও হাদিসে এর গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং আধুনিক যুগে জিহাদ মানে শান্তি, ন্যায় ও মানবিকতার জন্য সংগ্রাম। এভাবেই জিহাদ মুসলিম জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যা ব্যক্তিগত উন্নতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ
তৈরিকরে।

জিহাদের ফজিলত

নিঃসন্দেহে জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ কুরবানী দেওয়া অত্যন্ত বড় ত্যাগ এবং মানবীয় প্রকৃতির জন্য খুবই কষ্টকর। এজন্য এ ইবাদতের সাওয়াব ও পুরস্কারও অভাবনীয়। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের অফুরন্ত সাওয়াব ও পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং জিহাদের ইবাদত পালনের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ জিহাদ যখন বৈধ বা শরীয়ত সম্মত হবে তখন যে ব্যক্তি মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে তখন সে এ অভাবনীয় পুরস্কার লাভ করবে। এছাড়া জিহাদের আবেগ ও আগ্রহ মুমিনের হৃদয়ে থাকবে। জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের কুরবানীর প্রতি অনীহা ঈমানের দুর্বলতা প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَن مات ولم يَغزُ ، ولم يحدِّث به نفسَه ، مات علَى شُعبةٍ من نفاقٍ

"যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি এবং যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলে নি, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।"[মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৭।] আমরা দেখব যে, সাধারণভাবে জিহাদ ফরয কিফায়া এবং রাষ্ট্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ফরয আইন। ফরয কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয আইন অবস্থায় যদি মুসলিমগণ তা পরিত্যাগ করে তবে তা তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা বয়ে আনবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إذا تبَّايعتم بِّالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بِّالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

"যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুরু লেজ ধারণ করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।" [আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/২৭৪; আলবানী, সহীহাহ ১/১৫। হাদিসটি সহীহ।]

এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে অনেক সময় আবেগী মুমিন ভুল বুঝেন যে, জিহাদের বিষয়ে যেহেতু বেশি বেশি নির্দেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছে এবং বেশি বেশি পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেহেতু জিহাদ সালাত-সিয়ামের মতই ইবাদত অথবা সালাত সিয়ামের চেয়েও বড় ইবাদত। কারণ মহান আল্লাহ সালাত ও সিয়াম ফরয করেছেন এবং তিনিই জিহাদ ফরয করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন **(كتب عليكم الصيام)** তোমাদের উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে'' [সূরা (২) বাকারা: ১৮৩ আয়াত।] এবং তিনিই বলেছেন **(كتب عليكم القتال)** তোমাদের উপর কিতাল বা যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে''।[সূরা (২) বাকারা: ২১৬ আয়াত।]

কাজেই সালাত, সিয়াম ও জিহাদ-কিতালের মধ্যে পার্থক্য করলে বা সালাত পালন করে জিহাদ-কিতাল পালন না করলে ইসলাম পালন করা হবে না।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, কুরআনে কোনো ইবাদতেরই বিস্তারিত বিধান ও শর্তাবলি উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও সুন্নাতের সামগ্রিক নির্দেশনার আলোকে তা জানতে হয়। কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, জিহাদ সালাত সিয়াম ইত্যাদির মত 'ফরয আইন' বা দীনের রুকন নয়, বরং তা ফরয কিফয়া ইবাদত। জিহাদের শর্তগুলি পূরণ সাপেক্ষ জিহাদ বৈধ বা ফরয হলে উম্মাতের কিছু সদস্য তা পালন করবেন। এতে উম্মাতের সকলের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। অন্যরা পাপমুক্ত হবেন, তবে এ ইবাদত পালনের সাওয়াব তারা পাবেন না। যারা এ ইবাদত পালন করবেন তারা এ ইবাদত পরিত্যাগকারীদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করবেন, তবে পরিত্যাগকারীরা পাপী হবেন না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ...

মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ....।''[সূরা (৪) নিসা: ৯৫ আয়াত।]

এখানে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, কোনোরূপ ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তবে সে পাপী হবে না, শুধু অতিরিক্ত সাওয়াব ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। এ অর্থে এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال أيُّ الناسِ أفضلُ ؟ فقال رجلٌ يجاهد في سبيلِ اللهِ بمالِه ونفسِه قال :ثم من ؟ قال مؤمنٌ في شِعبٍ من الشِّعابِ ، يعبدُ اللهَ ربَّه)وفي رواية :يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين (ويدعُ الناسَ من شرِّه

''একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর নিকট আগমন করে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেন: যে মুমিন নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। লোকটি বলে, এরপর সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন: যে মুমিন মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বিজন উপত্যাকায় থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: এভাবে নির্জনে একাকী সে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মৃত্যু আগমন পর্যন্ত তার প্রতিপালকের ইবাদত করে) এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।''[মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫০৩।] এভাবে সমাজ ও জিহাদ পরিত্যাগ করে বিজনে নির্জনে একাকী বসবাস করে দীনের আরকান ও আহকাম পালনের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন, তবে পাপী বলে গণ্য হলেন না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

''মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয়।'' [সূরা (৯) তাওবা: আয়াত ১২২।]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিতামাতার খেদমত বা অনুরূপ দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَهُ في الجهادِ فقالَ :أحيٌّ والداكَ ؟ قال :نعَم قال :ففيهِما فجاهِدْ)فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما

''এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে: হ্যাঁ। তখন

তিনি বলেন: তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমন ও সাহচার্যে জীবন কাটাও।'' [বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫।]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুবাহিনী যদি রাষ্ট্র দখল করে নেয়, বা রাষ্ট্র যদি বহির্শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেনাবাহিনীর পক্ষে আগ্রাসন রোধ সম্ভব না হয়, এবং রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ ফরয আইনে পরিণত হয়। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل امة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

''যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরয কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে অবতরণ করে তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।'' [কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি.), আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ৩/৩৮।] তাফসীর, হাদীস-ব্যাখ্যা ও ফিকহের প্রায় সকল গ্রন্থেই বিভিন্ন শব্দে ও বাক্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দেব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (ছফ ৬১/১০-১১) ।করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ'

তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়। অতঃপর তারা মারে ও মরে' (তওবাহ ৯/১১১) ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ۝

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে একশতটি স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতিটি স্তরের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, তখন 'ফেরদৌস' প্রার্থনা করবে। কেননা এটিই হ'ল জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ স্তর। এর উপরেই আমাকে আল্লাহর আরশ দেখানো হয়েছে। আর এখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে'। [বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৮৭; ফাৎহুল বারী হা/২৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।]

তিনি বলেন,

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

'যার পদযুগল আল্লাহর রাস্তায় ধূলি ধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'। [বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৯৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।] 'পদযুগল ধূলি ধূসরিত হওয়া' অর্থ, দেহ-মন সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।

যেমন অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা, দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হ'তে উত্তম'। [মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৯২ 'জিহাদ' অধ্যায়।]

তিনি বলেন,

الْقَتْلُ فِى سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

‘আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া সকল পাপকে মোচন করে ঋণ ব্যতীত। [মুসলিম হা/১৮৮৬, মিশকাত হা/৩৮০৬।]
তিনি বলেন,

لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ- وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِهِ- إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ

‘কেউ আল্লাহর রাস্তায় আহত হ’লে, আর আল্লাহ ভালো জানেন কে তার রাস্তায় আহত হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষতস্থান হ’তে রক্ত ঝরতে থাকবে। যার রং হবে রক্তের ন্যায়, কিন্তু সুগন্ধি হবে মিশকের ন্যায়’। [মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০২ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।]
রাসূল (ﷺ) বলেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাকে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ দেওয়া হলেও পুনরায় সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, শহীদ ব্যতীত। তাদের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে, যাতে সে দশবার শহীদ হ’তে পারে। [মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০৩।]
আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালক হ’তে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে’ (আলে ইমরান ৩/১৭৯) ।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,
তাদের আত্মাসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর আরশের নীচে ফানুস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তারা জান্নাতে যথেচ্ছ বিচরণ করে। পরে তারা আবার ঐসমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। তখন তাদের রব তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও? উত্তরে তারা বলে, আমরা আর কিসের আকাংখা করব? আমরা তো জান্নাতের যেখানে খুশী বিচরণ

করছি। আল্লাহ তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলিকে পুনরায় আমাদের দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হ'তে পারি। অতঃপর যখন আল্লাহ দেখবেন যে তাদের আর কিছু প্রয়োজন নেই, তখন তাদের ছেড়ে দিবেন'।[মুসলিম হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/৩৮০৪।]
তিনি বলেন,
আল্লাহর নিকটে শহীদদের জন্য ৬টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে (ক) শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়তেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালেই তাকে জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হয় (খ) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয় (গ) ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হ'তে তাকে নিরাপদ রাখা হয় (ঘ) সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে। যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু হতে উত্তম (ঙ) তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হূরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে এবং (চ) ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে।[তিরমিযী হা/১৬৬৩, ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯, মিশকাত হা/৩৮৩৪।]

حدثنا ابو عوانة، عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد قال " لا تستطيعونه " . فردوا عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول " لا تستطيعونه " . فقال في الثالثة " مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله " . قال ابو عيسى وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وابي موسى وابي سعيد وام مالك البهزية وانس بن مالك . وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

আবূ 'আওয়ানা (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমান কি আমল হতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না। সাহাবীরা দু'বার কি তিনবার একই প্রশ্নের পুনারাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারেই তিনি বললেন, তোমরা তাতে সক্ষম নও। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদের উদাহরণ হলো সে সিয়াম পালনকারী ও সালাত (নামায/নামাজ) কায়েমকারীর মত যে তার সালাত ও সিয়াম পালনে কখনো ক্লান্ত হয় না যতদিন না

আল্লাহর পথের সে মুজাহিদ তার ঘরে ফিরে আসে। সহীহ, সহীহাহ ২৮৯৬, মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ১৬১৯ [আল মাদানী প্রকাশনী]

এই বিষয়ে শাফফা, আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী। আবূ মূসা, আবূ সাঈদ, উম্মু মালিক বাহযিয়্যা ও আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (রহঃ) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثني مرزوق ابو بكر، عن قتادة، عن انس بن مالك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني " يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله هو على ضامن ان قبضته اورثته الجنة وان رجعته رجعته باجر او غنيمة " . قال هو صحيح غريب من هذا الوجه .

মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু বাযী (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার পথের মুজাহিদরা আমার দায়িত্বে। যদি তার রূহ কবয করি তবে তাকে আমি জান্নাতে ওয়ারিছ করব আর যদি তাকে (বাড়িতে) ফিরিয়ে আনি তবে ছওয়াব বা গনীমতসহ তাকে ফিরিয়ে আনবো। সহীহ, তা'লীকুর রাগীব ২/১৭৮, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ১৬২০ [আল মাদানী প্রকাশনী]

জিহাদ ও ভুল ব্যাখ্যা

জিহাদ ইসলামে একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা আত্মসংযম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার সংগ্রামকে বোঝায়। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এবং বিশেষ করে আধুনিক যুগে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক উগ্র গোষ্ঠী জিহাদের নাম ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদ চালিয়েছে, আবার পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনৈতিক মহল প্রায়ই জিহাদকে সন্ত্রাসবাদের সমার্থক হিসেবে প্রচার করেছে। ফলে বিশ্ববাসীর কাছে জিহাদের প্রকৃত অর্থ আড়াল হয়ে গেছে। ইসলামী আলেমরা বারবার ব্যাখ্যা করেছেন যে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া সাধারণভাবে সন্ত্রাস মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য এ যে, যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা যোদ্ধা অযোদ্ধা সবাইকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করতে থাকে। যেন এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশি¬ষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট 'রাজনৈতিক পরিবর্তন' করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন তারাই এরূপ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে "ইসলাম' ' -এর সম্পর্ক কতটুকু? বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে "ইসলাম' ' -কে সন্ত্রাসের জনক বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সন্ত্রাস বলতে যা বুঝানো হয় তার শুরু হলো ইহূদী উগ্রবাদীদের দ্বারা। প্রাচীন যুগ থেকে ইহূদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ' ও 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহূদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রবাদী এ সকল ইহূদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহূদী রোমান

রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহঅবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য এরা সিকারী (the Sicarii: dagger men) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না। এদের হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণ ও প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করা। এজন্য তাদের টার্গেটকে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজার, উপাসনালয়, উৎসবকেন্দ্র বা অনুরূপ জনসমাবেশের মধ্যে আক্রমন করে হত্যা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সকল হত্যাকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা এবং রোমান প্রশাসন ও তাদের 'দালালদেরকে' তাদের কর্মকান্ডের সংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করা।[Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & article: Zealot Microsoft Encarta 2007. 1993-2006, terrorism.]

মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (the Reformation and the Counter-Reformation) -এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভুত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।[Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & Idelogy.] পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে আমরা যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখতে পাই। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ হয়েছে। যেমন মুসলিম রাষ্টের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্টের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে, অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। ইসলামের ইতিহাসের প্রচীন দু-একটি ঘটনার কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। তার আগে আমরা বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করি। বর্তমানে কিছু মুসলিম বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা করছে বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে শোনা যায়। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস। বিন লাদেন বা তার বাহিনী তা করেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র এ দাবির ভিত্তিতে আফগানিস্তানের ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র অযোদ্ধা নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনোভাবেই

বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের গুয়ান্তামো বে-তে সকল মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাহ্যত এদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ ও বিচারকদের সামনে পেশ করার মত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই বলেই এরূপ করা হচ্ছে। যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়া বা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে সন্ত্রাসের ইতিহাস পাঠ করুন। দেখবেন সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান খুবই কম। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাসের উৎপত্তি ইহূদী যীলটদের (Zealots) হাতে। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে, ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে অগণিত সন্ত্রাসী দল ও সন্ত্রাসী ঘটনা পাবেন। এদের প্রায় সকলেই ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ভারতে, আমেরিকায় বা অন্যত্র কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা হলেই প্রথমে মুসলিমদেরকে দায়ী করা হয় এবং প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয়। পরবর্তী তদন্তে অনেক সময় এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায় না, অথবা প্রমাণিত হয় যে, অন্যরা তা করেছে। কিন্তু সাধারণত প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয় না। এরপরও যদি মুসলিমদের নামে কথিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে তা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী ঘটনার কত পারসেন্ট? ১ বা ২ পারসেন্টও নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'ইসলামী জঙ্গিবাদ' , 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও হত্যা' র বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে, প্রকৃতই কিছু মুসলিম ইসলামের নামে, ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বা অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সত্য ও মিথ্যা এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি।
কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

“যারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। (সূরা আল-মায়েদা ৩২) ।

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে নিরীহ মানুষ হত্যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অথচ সন্ত্রাসবাদ ঠিক এই কাজটিই করে–নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ভয় সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যা কখনোই নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।” (আবু দাউদ)। এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, জিহাদ মানে সত্য প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সন্ত্রাস নয়। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে যে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ, যা প্রমাণ করে জিহাদ মূলত একটি নৈতিক ও আত্মিক সংগ্রাম।

পশ্চিমা মিডিয়া প্রায়ই জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে উপস্থাপন করে। বিশেষ করে ৯/১১ ঘটনার পর থেকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলোতে “জিহাদ” শব্দটি প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে “টেররিজম” বা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে। গবেষক এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর Covering Islam গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পশ্চিমা মিডিয়া ইসলামকে প্রায়ই সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপন করে, অথচ ইসলামের মূল বার্তা শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। জন এসপোসিটো তাঁর Unholy War: Terror in the Name of Islam গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদকে এক করে দেখা একটি গুরুতর ভুল, কারণ জিহাদ মূলত আত্মরক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। উদাহরণস্বরূপ, ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনকে পশ্চিমা মিডিয়া “টেররিজম” বলে, অথচ ইসরায়েলের আগ্রাসনকে “আত্মরক্ষা” হিসেবে তুলে ধরে। এই ধরনের শব্দচয়ন পক্ষপাতদুষ্ট এবং বাস্তবতা আড়াল করে।

ইসলামী আলেমরা জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী তাঁর তাফহীমুল কোরআন গ্রন্থে বলেছেন, জিহাদ মূলত ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য বৈধ। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে ইসলাম কখনো অন্যায় আগ্রাসনকে সমর্থন করে না। আধুনিক আলেমরা জিহাদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন–আত্মিক জিহাদ (নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম), বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ (জ্ঞান ও দাওয়াতের মাধ্যমে সত্য প্রচার), সামাজিক জিহাদ (অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন),

এবং সশস্ত্র জিহাদ (শুধু আত্মরক্ষা বা নিপীড়িতদের রক্ষার জন্য বৈধ)। এভাবে আলেমরা দেখিয়েছেন যে জিহাদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায়, মক্কা যুগে মুসলিমরা ধৈর্য ও দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ করেছেন। তারা নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু প্রতিশোধ নেননি। মদীনা যুগে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহর অনুমতিতে মুসলিমরা যুদ্ধ করেছেন, যেমন বদর, উহুদ ও হুনাইনের মতো যুদ্ধগুলোতে। এসব যুদ্ধ মুসলিম সমাজকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেছে এবং স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে। বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা সংখ্যায় কম হলেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করেন। উহুদের যুদ্ধে তারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তাদেরকে আরও দৃঢ় করে তোলে। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমরা আবারও প্রমাণ করেন যে জিহাদ শুধু অস্ত্রের শক্তি নয়, বরং ঈমানের দৃঢ়তা।

আধুনিক যুগে জিহাদ মানে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম–দুর্নীতি, অন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, কারণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমাজকে উন্নত করে। নৈতিক জিহাদ মানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সততা, ন্যায় ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করা। আজকের বিশ্বে জিহাদ মানে শান্তি, ন্যায় ও মানবিকতার জন্য সংগ্রাম। ইসলামী আলেমরা বলেন, সন্ত্রাসবাদ ইসলামের শিক্ষা বিরোধী, কারণ ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও মানবিকতার ধর্ম।

সবশেষে বলা যায়, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জিহাদ হলো আল্লাহর পথে সংগ্রাম, যা ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবিকতার জন্য। সন্ত্রাসবাদ হলো অন্যায় সহিংসতা, যা নিরীহ মানুষ হত্যা করে ভয় সৃষ্টি করে। পশ্চিমা মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট উপস্থাপনা জিহাদের প্রকৃত অর্থকে আড়াল করেছে, কিন্তু ইসলামী আলেমরা বারবার ব্যাখ্যা করেছেন যে জিহাদ শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সন্ত্রাস নয়। তাই মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হলো জিহাদের প্রকৃত অর্থ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, যাতে ভুল ধারণা দূর হয় এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

সমকালীন বিশ্বের সকল অশান্তি, যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অন্যতম কারণ ফিলিস্তিনে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যের তেল, মুসলিম দেশগুলির সম্পদ ও ভৌগলিক অবস্থান ও ইউরোপআমেরিকার উগ্র ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদী নব্য রক্ষণশীল (neoconservatives) বা নিওকনদের আবির্ভাব ও আধিপত্য। পবিত্র বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের অবস্থান বিশ্বে অশান্তির অন্যতম কারণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আল্লাহর বিধান পালন ও মানবজাতির কল্যাণের বিনিময়ে ফিলিস্তিনে তাদের বাসস্থান প্রদানের ওয়াদা করেন। কিন্তু পুরোহিতদের বিকৃতির কারণে তারা এ ওয়াদাকে তাদের জাতিগত সম্পদ বলে গণ্য করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়। ইস্রায়েল-সন্তানগণ খৃস্টপূর্ব ১২৮৫ সালের দিকে মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে মিসর থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রায় আড়াইশত বৎসর বিভিন্ন স্থানে বসবাসের পর খৃস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে তালুতের এবং এরপর দাউদের (আঃ) নেতৃত্বে তারা ফিলিস্তিনে ইহূদী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বকালের প্রায় ৬৫ বৎসর এ রাজ্য ভালভাবে চলে। সুলাইমানের (আঃ) ইন্তেকালের পরে তাঁর রাজত্ব দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তী প্রায় তিনশত বৎসরের ইতিহাস হলো রাজত্বের উভয় অংশের পারস্পরিক এবং পার্শবর্তী রাজ্যগুলির সাথে তাদের অভাবনীয়- অবর্ণনীয় রক্তারক্তি ও হানাহানির ইতিহাস।

খৃস্টপূর্ব ৬০৬ থেকে ৫৮৭ সালের মধ্যে ব্যাবিলনের শাসক নেবুকাদনেজার কয়েকবার আক্রমনের মাধ্যমে জেরুজালেম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন এবং ইস্রায়েলীয়দেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে তারা মুক্তি লাভ করে এবং জেরুজালেমে ফিরে আসে। পরবর্তী প্রায় ৫০০ বৎসর ইস্রায়েলীরা গ্রীক, সিরিয় বা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে জেরুজালেমে বসবাস করে। সর্বশেষ ১৩৬ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হার্ডিয়ান (Hadrian :১১৭-১৩৮) জেরুজালেম ও মসজিদে আকসা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। তিনি ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে চিরতরে বিতাড়িত করেন। অধিকাংশ ইহূদীকে বন্দী করে রোমে নিয়ে যান। তিনি ইহূদীদের জন্য জেরুজালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। শুধু বৎসরে নির্ধারিত একদিন

ক্রন্দন করার জন্য আগমনের অনুমতি ছিল তাদের। এ হলো জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস। এ ইতিহাস শুধু রক্তের ইতিহাস। ইহূদীগণ যতদিন জেরুজালেমে ছিল ততদিন এতদাঞ্চলের কোনো মানুষই শান্তিতে থাকতে পারে নি। তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তি করেছে, নবী-রাসূলগণকে হত্যা করেছে, পার্শবর্তী দেশগুলিতে রক্তারক্তি ও হানাহানি রফতানি করেছে এবং পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করেছে। ইহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল থেকে তাদের প্রতারণা, জবরদখল, গণহত্যা, গণধ্বংসযজ্ঞ, অনাচার ও ধর্মদ্রোহিতার ইতিহাস বিস্তারিতভাবো জানা যায়। ইস্রায়েলীয়দের রক্তারক্তি ও হানাহানি এতই অস্বাভাবিক ছিল যে, পার্শবর্তী রাজাগণ তাদের রাজ্য দখল করার পরে একাধিকবার তাদেরকে এলাকা থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়ন করেছেন। বিশ্বের ইতিহাসে জয়পরাজয়ের অনেক ঘটনা রয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বিতাড়নের এরূপ ঘটনা তেমন দেখা যায় না।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বৎসর ইহূদীগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করেছে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকার সহায়তায় হাজার হাজার বৎসর ধরে ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আররদেরকে হত্যা ও বিতাড়ন করে ফিলিস্তিনে আবার ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।
বাইবেলের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফিলিস্তিনে ইহূদীদের প্রথম অবস্থানের প্রায় হাজার বছরে কখনোই তারা পার্শবর্তী কোনো দেশের মানুষদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। এথেকে বুঝা যায় যে, ফিলিস্তিনে ইস্রায়েলীয়দের অবস্থান এতদাঞ্চলের অশান্তির মূল কারণ। যতদিন তারা তথায় থাকবে ততদিন কোনোভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ তাদের অনাচার, অত্যাচার ও দুবার জেরুজালেম ধ্বংস ও তাদের বিতাড়নের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন:
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا
‘আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে করুণা করবেন। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর তবে আমিও প্রত্যাবর্তন করব’ [(বনী ইসরাইল): ৮ আয়াত।]
এ থেকে বুঝা যায় যে, ১৩৬ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিতাড়নের পরে, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পরে পুনরায় একবার তাদেরকে জেরুজালেমে বসবাসের সুযোগ আল্লাহ দিতে

পারেন এবং জেরুজালেমে ফেরার পরে যদি তারা আবার তাদের আগের স্বভাব ও কর্মে ফিরে যায় তাহলে আল্লাহও আবার তাদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করাবেন। কুরআনের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ তাদেরকে আরেকবার করুণা করেছেন। কিন্তু তারা আবারো তাদের পূর্বের স্বভাব ও কর্মে ফিরে গিয়েছে। কাজেই অশান্তি চলতে থাকবে এবং বিতাড়নের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী থেকেও তা জানা যায়।

ফিলিস্তিনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করেছে। এর সাথে মিলিত হয়েছে নব্য রক্ষণশীলদের ধর্মচিন্তা। ইউরোপে এবং বিশেষ করে আমেরিকায় খৃস্টধমীয় মৌলবাদিতা ও রক্ষণশীলতা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। যারা খৃস্টধর্মের ইতিহাস জানেন তারা নিশ্চিত জানেন যে, খৃস্টধর্মীয় রক্ষণশীলতার অর্থই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন, গ্রীক ও রোমানগণ সর্বদা অন্যান্য মানবগোষ্ঠীকে বর্বর বলে চিত্রিত করেছে এবং একমাত্র তাদের সভ্যতাকেই উন্নত সভ্যতা বলে চিত্রিত করেছে। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার উত্তরসূরী ইউরোপ-আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের মানুষেরা এ উন্নাসিকতার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। তারা সর্বদা তাদের সহনশীলতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদ (Pluralism) নিয়ে গর্ব ও গৌরব করেন। তাদের এ বহুত্ববাদ বড় অদ্ভুত!
আমেরিকান, বৃটিশ, আইরিশ বা অন্য কোনো দেশের খৃস্টধর্মের অনুসারী কোনো সন্ত্রাসীকে "খৃস্টান সন্ত্রাসী" বললে তারা আহত হন এবং এরূপ বলাকে অসহিষ্ণুতা বলে মনে করেন; কারণ এতে ধর্মপ্রাণ সৎ খৃস্টানগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোনো সন্ত্রাসীকে "মুসলিম সন্ত্রাসী" বলতে অসুবিধা আছে বলে তারা মনে করেন না। উপরন্তু ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করলেও কোনোরূপ অসহিষ্ণুতা হয় বলে তারা মনে করেন না, বরং এরূপ কথার প্রতিবাদই অসহিষ্ণুতা!
এ বহুত্ববাদের কারণে ইসলাম বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে বক্তব্য, কার্টুন, সিনেমা, সাহিত্য ইত্যাদিকে বাকস্বাধীনতা বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু "এন্টি সেমিটিযম" (Anti-Semitism) আইনের নামে ইহূদী জাতি ও ধর্ম বিষয়ক ঐতিহাসিক গবেষণা ও মতপ্রকাশ নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় করা হয়েছে, ব্লাসফেমি

(Blasphemy) আইনের মাধ্যমে খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় করা হয়েছে।

এ বহুত্বের শর্ত merge বা একীভূত হওয়া। যে বিষয়কে তারা 'তাদের নিজস্ব' বলে গণ্য করবেন তা বিনা বাক্যে মেনে নিয়ে তার মধ্যে একীভূত হলেই কেবল তাদের বহুত্ববাদের কল্যাণ লাভ করা যাবে। আর এর বিপরীত মত, কর্ম, কৃষ্টি বা সভ্যতাকে তারা সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হন। এজন্য যখন তারা "খৃস্টধর্ম" -কে তাদের নিজস্ব বলে গণ্য করেছেন তখন ইহূদী ও মুসলিমদের আইন করে দমন, নির্মূল বা ধর্মান্তর করেছেন। অনুরূপভাবে "খৃস্টধর্ম" বিরোধী মতামত প্রকাশকারী সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদদের দমন ও নির্মূল করেছেন। একই কারণে প্রটেস্ট্যান্টগণ ক্যাথলিকদেরকে এবং ক্যাথলিকগণ প্রটেস্ট্যান্টদেরকে দমন, নির্মূল বা ধর্মান্তর করেছেন। এরূপ বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ ধার্মিক নিও-কনদের আধিপত্য আবার সেই পুরাতন জবরদস্তি, ধর্মান্তর ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কথা মনে করায়।

আর সাম্রাজ্যবাদীদের ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ হাত ধরাধরি করে চলে। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ করেছে সেখানেই তারা নানা কৌশলে ধর্মান্তর করতে চেষ্টা করেছে। এখনো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি মিশনারি আগ্রাসনের প্রস্তুতির সংবাদ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তথায় মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যরা এবং তাদের ছত্রছায়ায় অন্যান্য প্রচারক সরাসরি অথবা সেবার নামে ধর্মান্তরের বহুমুখি চেষ্টা চালাচেছন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপজাতি ও সংখ্যালঘুদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ন্ত্রণ, খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের ইহূদীদেরকে ফিলিস্তিন-জেরুজালেমে একত্রিত করে যীশুখৃস্টের পুনরাগমনের প্রেক্ষাপট তৈরি এবং মুসলিম দেশগুলিকে অস্থিতিশীল করে তাদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদিকে ফিলিস্তিন, ইরাক ও অন্যান্য দেশে নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশুরেদেক গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, এ সকল মানবতা-বিরোধী অপরাধের সরব সমর্থনের পাশাপাশি এগুলির বিরুদ্ধে সকল কণ্ঠকে নীরব করে দেওয়া হচ্ছে। বিক্ষুদ্ধ কেউ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিলে তাকে "ইসলামী জঙ্গি" বলে

আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিনা প্রমাণে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনাকে ইসলামী জঙ্গিদের কর্মকান্ড বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ যুবকদের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে তাদেরকে ডেকে এনে অস্ত্র, ট্রেনিং ও সমর্থন দিয়ে জঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে। এরপর আর জঙ্গিবাদের অভিযোগে তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উপসংহার

গবেষণাপত্রটির সামগ্রিক পর্যালোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামে জিহাদ একটি অত্যন্ত পবিত্র, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সুশৃঙ্খল ইবাদত, যা কেবল যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । এটি মূলত আত্মশুদ্ধি, নৈতিকতা রক্ষা, সমাজে ইনসাফ কায়েম এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা । গবেষণার উৎসগুলো থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম কখনোই অন্যায় আগ্রাসন বা নিরীহ মানুষ হত্যা সমর্থন করে না; বরং যুদ্ধের ময়দানেও নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং উপাসনালয় রক্ষার কঠোর নির্দেশনা প্রদান করে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে জিহাদকে প্রায়শই সন্ত্রাসবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, যা মূলত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অপব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণার ফল । উৎসগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদ যেখানে নিরপরাধ মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করে, সেখানে জিহাদ যুলুমের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে পরিচালিত হয় । পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃত জিহাদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি আদর্শিক ও মানবিক সংগ্রাম, যার মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে শান্তি এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা । জিহাদের গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।তবে মানুষের কাজের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব। এ গবেষণাতে যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণিত হলো তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষে থেকে, আর যা কিছু ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে।